কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে আন্তরিক হতে হবে সবাইকে — পৃঃ ১১

স্বস্তিকা

দাম : ষোলো টাকা

৭৫ বর্ষ, ১১ সংখ্যা।। ১৪ নভেম্বর, ২০২২।।
২৭ কার্তিক - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।।
website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ২৭ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১৪ নভেম্বর - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

নাগরিক বিলের বিপদ বুঝে রাজ্যপালের দিকে ঝুঁকছেন মমতা ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

দানখয়রাতির দিদি ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

মেধার পলায়ন থেকে মেধার প্রত্যাবর্তন ☐ অমিত শাহ ☐ ৮

ভারতের সুপার পাওয়ার হওয়ার প্রধান অস্ত্র টিম-মোদী ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে আন্তরিক হতে হবে সবাইকে ☐ সুকল্প চৌধুরী ☐ ১১

ভারতের শিক্ষা ও অর্থনীতিতে নেহরুর দুই ভুল ☐ নিখিল চিত্রকর ☐ ১৩

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে নেহরু কি উদাসীন ছিলেন? ☐ স্বপন দাস ☐ ১৫

মাদক জিহাদ বন্ধ করতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি একান্ত জরুরি ☐ মাধবী মুখার্জী ☐ ১৭

ওর ওর এবং ওরও, সবার আবদুল্লারা অন্তরে ও চরিত্রে অভিন্ন, তাই বুঝতে হবে সব আবদুল্লাই আদতে জেহাদি ☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ২৩

জিহাদিদের সঙ্গে বাম-তৃণমূলের সেটিঙে পশ্চিমবঙ্গের নাভিশ্বাস ☐ ড. তরুণ মজুমদার ☐ ২৬

আগাগোড়া ব্রিটিশ, খোলাখুলি হিন্দু ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ☐ শিতাংশু গুহ ☐ ২৯

এক সন্ন্যাসী রাজকুমারকে আজও মনে রেখেছে তিব্বত ☐ তন্বী শুকুল ☐ ৩১

গুপ্ত সমিতির খোঁজখবর ☐ অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় ☐ ৩৫

অনুচ্চারিত ইতিহাসের রহস্যভেদ ☐ দেবযানী ভট্টাচার্য্য ☐ ৪৩

সোনার সুযোগ হেলায় হারিয়েছেন নেহরু ☐ দিব্যেন্দু বটব্যাল ☐ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ৩০ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯ ☐ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
২১ নভেম্বর
২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২১ নভেম্বর
২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

জুয়ার বিজ্ঞাপনে আইকনরা

যাদের আমরা সিনেমার সুপারস্টার বা ক্রিকেটের আইকন মনে করি তাঁরা যখন সাধারণ মানুষকে জুয়া খেলার পরামর্শ দেন এবং রাতারাতি কোটিপতি হবার স্বপ্ন দেখান তখন তা ন্যায় ও যুক্তির সব সীমা ছাড়িয়ে যায়। আজকাল শাহরুখ খান, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সহ আরও অনেককে এমনই তিনটি পোর্টালের প্রচারকের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। এরা জুয়া খেলার টোপ দিলে অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েরা তো আকৃষ্ট হবেই। অতএব প্রশ্ন তো উঠবেই, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি এইসব সেলিব্রেটিদের কি কোনো দায়বদ্ধতা নেই? অর্থের বিনিময়ে এরা কি সবকিছু করবে?

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা এই প্রশ্নটিকে ঘিরে। লিখবেন সন্দীপ চক্রবর্তী, নিখিল চিত্রকর প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

With Best Compliments from :-

A

Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভ্রান্তিবিলাস

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর ছবির সমনে দাঁড়াইলে প্রথমেই যাহা দৃষ্টিগোচর হয় তাহা তাঁহার বুকপকেটে রক্ষিত একখানি গোলাপ। তিনি গোলাপ ভালোবাসিতেন। সম্ভবত মনে করিতেন গোলাপ হইল প্রেমের প্রতীক। দীর্ঘদিন গান্ধীজীর সংস্পর্শে থাকিবার ফলে অহিংসা হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহার জীবনের ব্রত এবং বিশ্বপ্রেম সেই ব্রত পালনের উপাচার। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইয়া যুদ্ধবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে প্রেম ও শান্তির বার্তা বহিয়া আনিবার প্রচেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন কিন্তু সফল হইতে পারেন নাই। সফল হইবার যৎসামান্য সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কেরা তাহাদের নিজ নিজ দেশের জাতীয় স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দেন। জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধবিগ্রহ করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। এমতাবস্থায় ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর শান্তিবার্তা যে ব্যর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশ নাই।

কিন্তু সমস্যা হইল বিশ্বপ্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া তিনি এমন কিছু সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন যাহা স্পষ্টই ভারতের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করিল কিন্তু ভারতীয় সেনার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। ভারতীয় সেনা যখন বীরবিক্রমে পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে, অচিরাৎ লাহোর হস্তগত হইবে, ঠিক এই সময়ে নেহরু অকস্মাৎ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিলেন। সুযোগটি পাকিস্তান সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিল। সেনা প্রত্যাহার করিল বটে কিন্তু সেনার স্থলে কাশ্মীরের উত্তরাংশে প্রবেশ করিল বর্বর, নৃশংস জিহাদি পাঠানরা। অভূতপূর্ব ধ্বংসলীলা চলিল সমগ্র কাশ্মীর জুড়িয়া। নেহরু চাহিলে ভারতীয় সেনা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাঠানদের সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিতে পারিত। কিন্তু তিনি তাহা চাহেন নাই। অতঃপর কাশ্মীরের উত্তরাংশ দখল করিল জিহাদি পাঠানরা। ভারতের অভ্যন্তরীণ একটি সমস্যার সমাধান স্বয়ং না করিয়া নেহরু রাষ্ট্রসঙ্ঘের শরণাপন্ন হইলেন। ইহাতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তিনি যুদ্ধবিরোধী শিরোপা লাভ করিলেন এবং বিস্তর করতালিও জুটিল, কিন্তু কপাল পুড়িল ভারতের। কালক্রমে পাঠান হানাদারদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে পাকিস্তানি সেনা। এবং আজিও কাশ্মীরের উক্ত অংশকে দখলমুক্ত করা যায় নাই।

এতাদৃশ ভ্রম নেহরু বারংবার করিয়াছেন। কিন্তু সমালোচিত হইয়াও কখনোও ভ্রম স্বীকার করেন নাই। ভারত স্বাধীন হইবার পর বালুচিস্তান ও নেপাল ভারতের অঙ্গরাজ্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু নেহরু রাজি হন নাই। যদি রাজি হইতেন তাহা হইলে সামরিক দিক হইতে ভারত সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করিতে পারিত। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হইবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া নেহরু মর্মান্তিক ভুল করিয়াছেন। আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন—দুই মহাশক্তিশালী দেশ বিভিন্ন সময়ে ভারতকে এই প্রস্তাব দিয়াছিল। নেহরু যে শুধুমাত্র ভারতের স্থায়ী সদস্য হইবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তাহাই নহে, চীন যাহাতে ভারতের স্থলে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হইতে পারে তাহার নিমিত্ত সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া তদবিরও করিয়াছিলেন। সমাজতন্ত্রের প্রতি নেহরুর তীব্র আকর্ষণ ছিল। সেই কারণেই সময় বিশেষে তিনি ভারতের জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া চীনের স্বার্থকে অগ্রধিকার দিয়াছেন। ইহাকে ভ্রম বলিয়া মানিয়া লইলে ন্যায়সঙ্গত হইবে কিনা গবেষকরা তাহার বিচার করিবেন। কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে ইহা ভ্রম নহে, মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

ড. ভীমরাও আম্বেদকর নেহরুর বিদেশনীতিকে 'বিরক্তিকর' বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে এই বিদেশনীতি যে ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে নিদারুণ 'উদ্‌বেগ ও দুশ্চিন্তা'র কারণ হইবে, তাহাও জানাইতে ভোলেন নাই। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, নেহরুর স্থলে তাঁহার আত্মজা ইন্দিরা গান্ধী যদি সেই সময় প্রধানমন্ত্রী থাকিতেন তাহা হইলে নেপালের ভারতভুক্তির অনুরোধ বৃথা যাইত না। অর্থাৎ নেপাল ভারতে অন্তর্ভুক্ত হইয়া অঙ্গরাজ্যে পরিণত হইত। ইন্দিরা স্বয়ং কাশ্মীর সমস্যার নিমিত্ত পিতাকে দায়ী করিয়াছিলেন। কিন্তু নেহরু তাঁহার বুকপকেটে রক্ষিত গোলাপের রক্তিমাভা ও সৌরভ অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কল্পনাবিলাসী বিশ্বকল্যাণের মাশুল গনিতে গনিতে দেশ যে মাত্রাতিরিক্ত রক্তক্ষরণে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, তাহা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কিংবা হইলেও তাহাকে দৃষ্টিবিভ্রম মনে করিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন।

সুভাষিতম্

হর্ষস্থান সহস্রাণি ভয়স্থান শতানি চ।।
দিবসে দিবসে মূঢ়ং অবিশন্তি ন পণ্ডিতম্।।

মূর্খদের প্রতিদিন আনন্দের জন্য হাজার কারণ এবং দুঃখের জন্য শ' কারণ উপস্থিত হয়। কিন্তু বিদ্বানরা এরকম ছোটো ছোটো কারণে বিচলিত হন না।

নাগরিক বিলের বিপদ বুঝে রাজ্যপালের দিকে ঝুঁকছেন মমতা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী ভাবছেন বা করবেন জোর দিয়ে বলা মুশকিল। তিনবছর ধরে রাজ্যপাল জগদীশ ধনকড়ের বিরোধিতা করেও উপরাষ্ট্রপতি ভোটে বিরোধী ভোট দেয়নি মমতার দল তৃণমূল। ঘুরিয়ে সমর্থন করেছিলেন। মমতার শিয়রে এখন নাগরিক কাঁটা। পশ্চিমবঙ্গ আর অসমে নাগরিক আইন চালু হতে চলেছে। ২০২৩-এর পাঁচ জানুয়ারির মধ্যে রাজ্যসভা আর লোকসভায় তার বিধি চালু হয়ে যাবে। ২০২০-র জানুয়ারি থেকে তা আটকে রয়েছে। পর্যালোচনা করতে সংসদের সাব-অর্ডিনেট কমিটি সাতটি বৈঠক করেছে। ২০১৯-এর ডিসেম্বরে ছাড় পায় নাগরিক আইন। মহামারীর কারণে আটকে যায়।

মমতা নাগরিক আইনের বিরোধী। মুখে না বললেও মমতার ভয় আইন চালু হলে রাজ্যে অশান্তি শুরু হয়ে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে পারে। সাংবিধানিক সংকট তৈরি হয়ে রাজ্যে ৩৫৬ ধারা বা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হতে পারে। সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে তার প্রভাব পড়তে পারে। রাজ্যে ১২৮টি মুসলমান আসন। সামনে পঞ্চায়েত ভোট। মমতার বড়ো ভয় সিমিএমকে নিয়ে, যাকে তিনি ধূলিসাৎ করেছেন। রাজ্যের মুসলমান ভোট ভাগ হলে মমতাকে হা-হুতাশ করতে হবে। মমতা নিশ্চিত, রাজ্যের মুসলমানদের ভোট পাবেন না। ওদিকে বিজেপির সংকট মতুয়া ভোট। মতুয়ারা বিজেপির থেকে সরে আসছে। এই মুহূর্তে বিজেপির ৭০ আসনের মধ্যে ৩৪টি মতুয়া আসন। মতুয়ারা যে অবহেলিত আর সব রাজনৈতিক দল যে দ্বিচারিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করছে তা বলা বাহুল্য। এখন অবধি বিজেপিও সদর্থক কিছু করেনি।

তৃণমূলের কিছু নেতার ধারণা সংশোধিত নাগরিক আইন (সিএএ) নয়, জাতীয় নাগরিক পঞ্জীকরণ (এনআরসি) আর জাতীয় জনসংখ্যার রেজিস্টার (এনপিআর) আগে তৈরি করতে হবে। পরে সিএএ। গুজরাট দিয়ে বিজেপি কেবল জল মেপেছে। তাই ১৯৫৫ সালের নাগরিক আইনকে তার ভিত্তি করেছে। তৃণমূলের সমর্থকরা নাগরিক আইনের অন্তর্ভুক্ত নয় অন্য সম্প্রদায়ের ওপর দরদ দেখিয়ে কুযুক্তি খাড়া করছে। রোহিঙ্গা মুসলমান আর তামিল উদ্বাস্তুদের টেনে আনছে। মমতা জানেন কেন্দ্রীয় সরকার সব সুরক্ষা নিয়ে ধর্মনিপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দিতে চাইছে। নাগরিক আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে ২৩২টি পিটিশন রয়েছে। আইনের সমর্থনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ৩০ অক্টোবর সর্বোচ্চ আদালতে ১৫০ পাতার হলফনামা জমা দিয়েছে। চারটি আইনের ওপর ভিত্তি করে তা করা হয়েছে। হলফনামা রহস্যে মোড়া, তাতে অনুপ্রবেশ আর অসম বিষয়ে কিছু বলা আছে। মমতা নিজেও ২০০৫ সালে কট্টর অনুপ্রবেশ বিরোধী ছিলেন। নাগরিক আইন বিরোধিতার লাইন তাঁর বেশ গোলমেলে মনে হয়।

গণেশনের বদলিতে যদি কেরলের আরিফ মহম্মদ খান পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়ে আসেন তা যে কত বড়ো বিপদের কারণ হবে তা মমতা ভালোই জানেন। তাই মনে হয় আগেভাগেই ব্যবস্থা করে রাখছেন।

নাগরিক আইনের খাঁড়া মমতার মাথায় ঝুলছে। তাই রাজ্যে ভারপ্রাপ্ত রাজ্যপাল লা গণেশনের সঙ্গে হয়তো সখ্য বৃদ্ধি করছেন মমতা। মণিপুরের পাশাপাশি তিনি পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত। চেন্নাইয়ে তাঁর পারিবারিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন মমতা। মমতার বাড়ির অনুষ্ঠানে এসে অবাক হয়ে গণেশন বলেছেন, ‘ মুখ্যমন্ত্রী এত ছোটো বাড়িতে থাকেন।’ ভাবটা মমতা নির্লোভ। রাজ্যে মমতার দুর্নীতি সত্ত্বেও রাজ্যপালের এই সার্টিফিকেট অনেকের কপালে ভাঁজ ফেলেছে। সবাই জানেন রাজ্যপাল একটি আদর্শ অনুসরণ করেন। যতদূর জানি তাঁর সঙ্গে মমতার কোনো সংঘাত নেই। মমতা বিশ্বাস করেন যে আদর্শে কোনো অন্যায় নেই। অনুসরণকারীদের ভেতর কেউ খারাপ নেই। তবে তার মানে এই নয় যে মমতার কোনো অন্যায়, দোষ বা দুর্নীতি রাজ্যপালের চোখে পড়বে না, যেমন চোখে পড়ত ধনকড়ের। তার আড়ালে আশ্রয় পেয়ে যাবেন, তা যদি মমতা ভেবে থাকেন সে গুড়ে বালি। ধনকড়ের মতো রাজ্যপাল লা গণেশনও তাঁকে ছেড়ে কথা বলবেন না। ভবিষ্যতে গণেশনের বদলিতে যদি কেরলের আরিফ মহম্মদ খান পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়ে আসেন তা যে কত বড়ো বিপদের কারণ হবে তা মমতা ভালোই জানেন। তাই মনে হয় আগেভাগেই ব্যবস্থা করে রাখছেন। □

দানখয়রাতির দিদি

মাননীয়া
খররাতপ্রিয় দিদি,

ভোট আসছে। গ্রামের ভোট। ২০১৮ সালের মতো করে জেতার পরিকল্পনা নিশ্চয়ই তৈরি। কিন্তু গ্রাম তো ভালো নেই গো দিদি। একশো দিনের কাজ মিলছে না। আপনি বলছেন, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। কিন্তু কেন্দ্র বলছে, বাঙ্গলায় হিসেবে গরমিল। গ্রামের মানুষও তাই বলছে। প্রশ্ন করছে, কেন্দ্র যে টাকা দিতে দায়বদ্ধ, রাজ্য সরকার তা আদায় করতে পারছে না কেন? একশো দিনের কাজের মতো সুবৃহৎ প্রকল্প রাজ্য নিজের টাকায় চালাবার পকিল্পনা নেওয়াই তো অপরিণামদর্শিতা। ঠিকাদার-নিযুক্ত শ্রমিকদের দৈনকি মজুরি মেটানোকে আদৌ এনআরইজিএ-র বিকল্প বলা যায় কি না, সে প্রশ্নও উঠেছে। অন্যান্য বিরোধী রাজ্য কেন্দ্রের তহবিল থেকে ওই প্রকল্পের টাকা পাচ্ছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গই কেবল ব্যর্থ হচ্ছে কেন?

শুনলাম শ্রম দপ্তরকে আপনি বলেছেন, সরকারি খরচে মেলা আয়োজন না করে সেই টাকা খরচ হোক শ্রমজীবীদের কাজ দেওয়ার প্রকল্পে। মন থেকে যে বলেননি আপনি সেটা আমি জানি। মেলা-খেলায় সরকারি টাকা ব্যয় করা যে অনর্থক তা বহুদিন ধরেই দাবি করে আসছেন বিরোধীরা। আপনার সরকারের আধিকারিকরাও বুঝিয়েছেন। সবাই বলেছেন, সরকারের ভাঁড়ারে যখন টানাটানি চলছে, তখন বাজেট-বহির্ভূত প্রকল্পে খরচ না করাই ভালো। কিন্তু আপনি পাত্তা দেননি। আসলে ভোটের খিদে বড়ো খিদে। আর তা মেটানোর সহজ পন্থা, সরকারি টাকা খয়রাতি। তাতে আবার ভাইয়েদের রোজগারের রাস্তাও খুলে যায়।

কিন্তু এখন কেন খরচ কমাতে বলছেন?

এই তো পুজো গেল। দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে আপনি ক্লাবগুলির অনুদানের মাত্রা বাড়িয়েছেন। উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কহীন খাতে ২৪০ কোটি টাকা খরচের পরে দিদি আপনার পক্ষে মিতব্যয়ী ভাবমূর্তি নির্মাণ করা কঠিন। বিভিন্ন প্রকল্পে ভাতা-অনুদানের অঙ্ক বাড়ানো, অথবা শর্ত শিথিল করে সেগুলির বিস্তার বাড়ানোও ব্যয় সঙ্কোচনের চেষ্টার সপক্ষে সাক্ষ্য দেয় না। অপচয় হয়েছে নানাবিধ অপরিকল্পিত প্রকল্পেও— 'দুয়ারে রেশন' রূপায়ণ করতে গিয়ে কয়েকশো কোটি টাকা গুনাগার গুনেছে রাজ্য, অবশেষে সেই প্রকল্প স্থগিতও করতে হয়েছে আদালতের নির্দেশে। আচ্ছা, এই প্রকল্পের কী দরকার ছিল? মানুষ হেঁটে পাড়ার রেশন দোকানে যেতে পারবেন না ভাবেন কি আপনি? সবাই বোঝে, মানুষের পয়সায় মানুষের দুয়ারে রেশন।

রাজকোষের প্রতিটি টাকার হিসাব দিতে সরকার দায়বদ্ধ। অথচ আপনার সরকার কী উদ্দেশ্যে, কোন খাতে, কত টাকা খরচ করছে, তা বাজেটেও স্পষ্ট হয় না। যে কোনও সঙ্কটের মুখে পড়লে তৃণমূল সরকার একটি নতুন প্রকল্পের সূচনা করে, যেন সদিচ্ছার ঘোষণাই সরকারের কাজ।

এখন শ্রমিক মেলা স্থগিত করতে চাইছে সরকার। কিন্তু গত কয়েক বছর জেলায় জেলায় শ্রমিক মেলা করে কতটুকু লাভ হয়েছে? শ্রমজীবীরা তাঁদের প্রাপ্য সম্পর্কে আরও সচেতন হয়েছেন কি না, অথবা আরও বেশি করে তাঁরা সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধার নাগাল পেয়েছেন কি না, তার হিসেবে কে করছে? তথ্যই-বা কোথায়? রাজকোষের প্রতিটি টাকার হিসাব দিতে সরকার দায়বদ্ধ। অথচ আপনার সরকার কী উদ্দেশ্যে, কোন খাতে, কত টাকা খরচ করছে, তা বাজেটেও স্পষ্ট করা হয় না। যে কোনও সঙ্কটের মুখে পড়লে তৃণমূল সরকার একটি নতুন প্রকল্পের সূচনা করে, যেন সদিচ্ছার ঘোষণাই সরকারের কাজ। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের একশো দিনের কাজের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন করেনি, তাই রাজ্য সরকার নিজের খরচে শ্রমিকদের কাজ দিতে চাইছে।

এই সিদ্ধান্ত সত্যিই আপত্তিকর। প্রথমত, কেন বার বার কেন্দ্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সমান্তরাল প্রকল্প ঘোষণা করছে রাজ্য? এর আগে স্বাস্থ্য বিমা কিংবা কৃষক অনুদান নিয়ে এমন পদক্ষেপই করেছে রাজ্য। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক, কোনও দিক থেকেই তার ফল তৃণমূল সরকারের জন্য বিশেষ সুবিধাজনক হয়নি, বরং বিপুল ক্ষয় হয়েছে রাজকোষে। এ রাজ্যে যখন সরকারি কর্মীদের পেনশন, ডিএ আটকে রয়েছে, তখন বাড়তি খরচের অঙ্গীকার করা কেন? কেন্দ্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সমান্তরাল প্রকল্প ঘোষণা করছে রাজ্য। কিন্তু পারবে কি ফেল করা সরকার?

এসব আমার কথা নয় দিদি। সবাই বলছে চারিদিকে। আপনি কান দেবেন না। খয়রাতি চলুক। ভোট আসছে। □

অতিথি কলম

অমিত শাহ

মেধার পলায়ন থেকে মেধার প্রত্যাবর্তন

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন স্থানীয় ভাষায় লেখাপড়ার চর্চাই ভারতের সম্ভবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদ্‌যাপনের এই পুণ্য বছরে ১৬ অক্টোবর তারিখটিও সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। এদিনই ভারতের মধ্যপ্রদেশ সরকার সে রাজ্যে হিন্দি ভাষায় ডাক্তারি পাঠ্যক্রম চালু করেছে। এই কাজের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বরাবরের স্থানীয় ভাষায় বিদ্যাচর্চা করার মতের ওপরই সিলমোহর পড়ল।

এই প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণে আনা যেতে পারে--- 'ভারতীয় সংস্কৃতি ঠিক একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো। সে ফুলটির প্রতিটি পাপড়ি যেন আমাদের প্রাদেশিক ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগুলি। পাপড়ির যে কোনো একটিকে নষ্ট করলেই পদ্মের সৌন্দর্য নষ্ট হবে। এই জন্য আমি চাই বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাগুলি সেখানকার রানির মতো থাকুক আর হিন্দি বিরাজ করুক কেন্দ্রে।' এই রাজ্যগুলির মধ্যে বিশ্বকবি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ভারতীয় সংস্কৃতির গুণবত্তা ও ভাষাগত বৈচিত্র্যের বিষয়টি।

একই ভাবে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র তাঁর 'নিজ ভাষা' গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রদেশগুলির ভাষার সফল প্রয়োগের অর্থই হচ্ছে নিজ ভাষাকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া। সমস্ত ভাষাই তো একান্ত ভাবে আমাদের নিজস্ব। ভারত ও ভারতীয়ত্বকে বুঝতে গেলে মানুষের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত থাকা সংস্কৃতিগতভাবে ও ঐতিহাসিকভাবে ভাষাগুলির প্রভাব অস্বীকার করা যাবে না। আদতে ব্যক্তি একটি ভাষার মাধ্যমেই জাতির সামগ্রিক সত্তা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে সঠিকভাবে যুক্ত করতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই কোনো ভ্রান্ত ধারণাকে প্রশ্রয় না দিয়ে এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে হিন্দির সঙ্গে অন্য কোনো ভারতীয় ভাষার কোনোরকম বিরোধ নেই। অনেক সময়ই এই ভুল প্রচারকে বাড়িয়ে তোলা হয় যে হিন্দি ভারতের অন্যান্য সমস্ত ভাষার বিরোধী। এর চেয়ে বড়ো ও ভুল ব্যাখ্যা কিছু হতে পারে না। হিন্দি সমগ্র ভারতের 'রাজভাষা' এবং এর সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষার কোনো বিরোধ নেই। হিন্দি সমস্ত ভারতীয় ভাষার বন্ধু এবং তাদের সঙ্গে সহযাত্রী হয়েই পথ চলছে।

তবে আমার ধারণায় হিন্দির ও অন্যান্য সকল ভারতীয় ভাষারই একটু নমনীয় হওয়ার প্রয়োজন আছে। এই নমনীয়তাটা একটু বাড়াতে পারলে ভাষাগুলির সঙ্গে হিন্দির কোনো দ্বন্দ্ব যদি থেকেও থাকে তা পারস্পরিক আলোচনা ও বিভিন্ন মতামত গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে সুবিধে হবে। সকলের মধ্যে একতার পরিস্থিতি তৈরি করতে এটা দরকার। একইসঙ্গে এর ফলে প্রত্যেকটি ভাষাই একটি প্রগতিশীল সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।

আমাদের দেশে বেশ কিছু লোক সর্বদা যে সমস্ত মানুষ ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী তাদের একটু বাড়তি মর্যাদা এবং নিজেদের থেকে উন্নত স্তরের মানুষ বলে মনে করে থাকে। কিন্তু মানুষের মেধা ও বৌদ্ধিক স্তরের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভাষার কোনো ভূমিকাই নেই। এটাই অকাট্য সত্য। একজন ব্যক্তির প্রজ্ঞা প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষা নিছক একটি মাধ্যম মাত্র। বাস্তবে একজন মানুষের

> "প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষা প্রদানের এই দৃঢ় সংকল্প ভারতীয় ভাষাগুলির উৎকর্ষ বৌদ্ধিক স্তরকেও গুণগতভাবে সমৃদ্ধ করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামী প্রজন্মগুলির মধ্যে দেশিয় ভাষারই প্রসার দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নতুন পথের সন্ধান দেবে।"

বৌদ্ধিক সক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে যে যদি তার জন্ম থেকে বলা বা শেখা স্থানীয় ভাষাটিকে ব্যবহারের সুযোগ পায় তার প্রতিভা আরও ঝলমলে হয়ে উঠতে পারে। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে মেধার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষা অর্জনে তার স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের কথাই বলা হচ্ছে। শিক্ষা স্থানীয় ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় গ্রহণ করলে একটি শিশুর বৌদ্ধিক অগ্রগতি পূর্ণ বিকশিত কখনোই হতে পারে না। এজন্য আমার দৃঢ় ধারণা শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভাষার মাধ্যমটির অসীম গুরুত্ব আছে।

বলা দরকার আমাদের দেশে প্রাদেশিক ভাষায় গবেষণা, বিজ্ঞানচর্চা, মানববিদ্যা এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে যথেষ্ট অভাব থাকার কারণে আমরা জাতিগতভাবে আমাদের সম্ভাবনাময় মেধা সম্পদের মাত্র ৫ শতাংশকে যথাযথ ব্যবহার করতে পেরেছি। এ প্রসঙ্গে ভারত যে আত্মনির্ভরতার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তাতে সাফল্য আনতে শিক্ষাকে প্রাদেশিক ভাষাকে মাধ্যম করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অন্যতম কার্যকরী পদক্ষেপ। প্রাদেশিক বা নিজের পিতৃপুরুষের চর্চিত ভাষাকেই উচ্চশিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে মেধার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে যাতে ব্যবহার করা যায়, নিজের ভাষাতেই যাতে গবেষণা, বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতাকে পূর্ণ প্রয়োগ করা সম্ভব হয়— সারা বিশ্বের শিক্ষাবিদরা এখন এই বিষয়টিকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। তাঁরা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রাদেশিক ভাষার বিকল্প নেই বলে মত দিয়েছেন।

গান্ধীজী সর্বদা উচ্চ প্রযুক্তি সংক্রান্ত ও উচ্চ-শিক্ষা অর্জনের উপযুক্ত বিষয়কে যাতে অন্য ভাষা থেকে রূপান্তর করে নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে দেওয়া যায় তারই ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'We should have an army of chemist, engineers and other experts... who will speak not in a foreign tonque but the language of the people. Their knowledge will be the common property of the people.'

গান্ধীজীর এই পথ নির্দেশকে অনুসরণ করেই মোদী সরকার নতুন শিক্ষা নীতি গ্রহণ করেছে। আর মধ্য প্রদেশই প্রথম MBBS পাঠ্যক্রমকে হিন্দিতে শিক্ষা দিচ্ছে। নতুন শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক হয়ে স্নাতক, প্রযুক্তিবিদ্যা, আইন এবং যে কোনো উচ্চশিক্ষার বিস্তার প্রাদেশিক ভাষাতেই এগোবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আত্মনির্ভরতার যে মন্ত্র গ্রহণ করেছেন মোদী তা কিন্তু কেবলমাত্র কাজ কারবার, বাণিজ্য বা সেবা ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সারা দেশে ভাষার সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে সামগ্রিক উৎকর্ষ সাধন করাও এর একটি উদ্দেশ্য। সেই কারণে আমাদের ভাষাগুলির উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের উপযুক্ত হয়ে ওঠার দিকেও নজর দেওয়া দরকার। নতুন শিক্ষা নীতিতে সেই কাঙ্ক্ষিত গুরুত্ব ও বিভিন্ন নির্দেশিকা সংযোজিত হয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা এখন তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম গুজরাটি, মারাঠি, বাংলা, অসমীয় ও হিন্দিতে পাওয়া যাবে। বিদেশি ভাষার বইগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে NEET ও UGC দ্বারা গৃহীত পরীক্ষাগুলি এখন ১২টি ভাষায় নেওয়া হচ্ছে। এর থেকে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হচ্ছে যে দেশের ভাষাগুলিকে শক্তিশালী ও প্রয়োজনানুগ করে তুলতে সরকার সব রকমের পদ্ধতি প্রয়োগ করছে।

বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দাদাভাই নওরোজি ভারত থেকে সম্পদ বহির্বিশ্বে চলে যাওয়াকে 'drain of wealth' বলেছিলেন। একবিংশ শতাব্দীতে আমরা এক নতুন বিষয় দেখছি 'Drain of brain'। একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে শক্তি ২০০ বছর আগে দেশের সম্পদ বিদেশি ভাষায় পড়াশোনায় উৎসাহ দিয়ে 'brain drain' এ সহযোগিতা করছে।

একথা নিশ্চিত করে বলা যায় এই brain drain-ই brain gain-এ পরিণত হবে যখন ভারতীয় তরুণ-তরুণীরা তাদের নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করবে। আজকের ভারত সরকার সর্বান্তকরণে চেষ্টা শুরু করেছে যাতে প্রাদেশিক ভাষায় সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে বিদেশি ভাষার জাতাকলে পড়ে অবদমিত হয়ে তারা বিদেশি সংস্কৃতিকেও না অকাতরে গ্রহণ করে। এর পরিবর্তে তারা তাদের বৌদ্ধিক স্তরকে নিজের ভাষায় উন্নত করে নতুন চিন্তাকে, কৌতূহলকে আরও সহজে ও মৌলিকভাবে প্রকাশ করতে পারবে। বিজেপি যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই চেষ্টা করেছে ভারতীয় ভাষাকে শক্তিশালী করতে। ইংরেজ শাসনের অবসানের পরও পরবর্তী সরকারগুলি দেশে দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় ভাষাগুলিকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি। তারা এক ধরনের হীনমন্যতায় ভুগত। ভারতবর্ষের নেতাদের গরিষ্ঠাংশ যে কোনো আন্তর্জাতিক পরিসর হলেই ইংরেজিতে বক্তৃতা করতেন। ভারতের একটা সময়ের বিদেশমন্ত্রী হিসেবে ইউনাইটেড নেশনসে প্রথম হিন্দিতে বক্তব্য পেশ করেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। ভারতীয় ভাষার সম্মান অর্জনের সেটি প্রারম্ভিক মুহূর্ত।

আজকের প্রধানমন্ত্রী সমস্ত আন্তর্জাতিক ফর্মে বাজপেয়ীর উত্তরাধিকারকে বহন করে হিন্দিতেই বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই হিন্দি বক্তৃতাগুলি কেবলমাত্র ভারতীয় ভাষাগুলির সমৃদ্ধিকেই প্রতিষ্ঠা দেয়নি একই সঙ্গে ভারতীয়দের আত্মবিশ্বাসকেও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষা প্রদানের এই দৃঢ় সংকল্প ভারতীয় ভাষাগুলির উৎকর্ষ বৌদ্ধিক স্তরকেও গুণগতভাবে সমৃদ্ধ করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামী প্রজন্মগুলির মধ্যে দেশিয় ভাষারই প্রসার দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নতুন পথের সন্ধান দেবে যা নাগরিকরা সানন্দে গ্রহণ করবে। □

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাসের মাতৃদেবী গত ৬ নভেম্বর নদীয়া জেলার বামুনপুকুর গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ৫ পুত্রবধূ, তিন কন্যা, ৩ জামাতা ও ১২ নাতি-নাতনিকে রেখে গেছেন।

ভারতের সুপার পাওয়ার হওয়ার প্রধান অস্ত্র টিম-মোদী

তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ বিশ্বে সর্বোচ্চ পর্যায়ের শক্তি হওয়ার দিকে এগোচ্ছে। শুধু অর্থনীতিতেই নয়, সামরিক, প্রতিরক্ষা, সামাজিক— সবদিক থেকেই। হ্যাঁ, দেশটার নাম ভারত। আর্থিক মন্দার বাজারে এবং অবশ্যই কোভিড-উত্তর পরিস্থিতিতে বিশ্বের তাবড় দেশগুলির আর্থিক হাল যখন বেহাল, আমেরিকা থেকে চীন—সর্বত্রই অর্থনীতির ঝিমুনি ভাব, সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, তখন গড় ভারতবাসীর জীবনে অন্তত আর্থিক নিরাপত্তাজনিত সেইরকম বড়ো ধরনের কোনো বিপর্যয় নেমে আসেনি। তার বড়ো একটি কারণ এই মহামারীজনিত আর্থিক দুর্দশাতেও ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা খাদ্যনিরাপত্তাটুকু অন্তত দিতে পেরেছে, লকডাউনের টানা সুদীর্ঘ সময়ে দেশবাসীকে বিনামূল্যে রেশন দিয়ে।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির নিন্দা করতে বিরোধীরা কথায় কথায় বাংলাদেশের প্রসঙ্গ টেনে আনতেন। সামান্য একটা উদাহরণ দিই। বাংলাদেশে গত একবছরে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের হার কমতে কমতে শূন্যতে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারত সেখানে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ে বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। বিরোধীরা ভারতে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কথা বলে থাকে। স্বস্তিকার পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাই, ইদানীং বাংলাদেশে জ্বালানির এতোই মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী গাড়ি চালানোর নতুন নিয়ম করতে বাধ্য হয়েছে।

যাঁরা আশা করেছিলেন, চীন আগামীতে ভারতকে কবজায় এনে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সুপার-পাওয়ার হয়ে উঠবে, তাদের বিস্ময়ে বিমূঢ় করে বর্তমানে বেহাল হয়েছে চীনের অর্থনীতি। সেদেশে চলছে গভীর অর্থসংকট, এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে সেখানে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাষট্টি হাজার দোকান। বিদ্যুৎ পরিস্থিতি এতটাই সংকটজনক যে বড়ো শিল্পক্ষেত্রেও দৈনিক পাঁচঘণ্টার বেশি বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা যাচ্ছে না। এর ফলে দ্রুততায় সংকুচিত হচ্ছে সেদেশের বিনিয়োগের বাজার। অন্যদিকে ভারতে গত আগস্ট মাসেই ৪৬ হাজার কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে। ভারত সরকারের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ প্রকল্পও বিপুল সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়নের পথে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের সফল কূটনৈতিক দৌত্য একদিকে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এতে কূটনীতি তো বটেই, ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক দিক দিয়েও ভারত লাভবান হয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর ভারসাম্যের এই রাজনীতি-কূটনীতি বারে বারে দেশবিদেশে উচ্চ-প্রশংসিতও হয়েছে। কিন্তু কীসের জোরে এই সাফল্যের সিঁড়িতে তরতর করে উঠছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত? তথ্যাভিজ্ঞমহল মনে করছে, রাজনৈতিক-স্বার্থ নিরপেক্ষ বরং দেশের স্বার্থে নিজস্ব একটা দল (টিম) দাঁড় করিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মন্ত্রীসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বহু যোগ্য ব্যক্তি থাকলেও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার স্বার্থে কর্মকুশল যোগ্য ব্যক্তিত্বদের নিয়ে টিম গড়েছেন মোদী, আর এই টিমস্পিরিটেই সাফল্যের চূড়ায় উঠছে দেশ, বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর (পিএমও)-কে নিছক সরকারি দপ্তর না করে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছেন মোদী।

এখন দেখে নেওয়া যাক, কারা রয়েছেন টিম-মোদীতে। প্রথমেই বলতে হয় মুখ্যসচিব পিকে মিশ্রর কথা। গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় মোদীর বিশেষ আধিকারিক ছিলেন পিকে মিশ্র। পরে ভারত সরকারের কৃষি আধিকারিকও হয়েছিলেন। কৃষিবিষয়ে তাঁর দক্ষতা প্রধানমন্ত্রীকে যারপরনাই সন্তুষ্ট করেছিল। টিম-মোদীর এই আধিকারিকের জন্য ভারত আজ কৃষিখাতে চীন-আমেরিকাকে টক্কর দিতে সফল হয়েছে।

মোদীর দ্বিতীয় সদস্যের নাম অজিত দোভাল। প্রাক্তন এই গোয়েন্দা প্রধান আজ ভারতের যাবতীয় সামরিক, প্রতিরক্ষা ও সীমান্ত নিয়ে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাণ্ডারি, যা বলার দরকার পড়ে না যে শক্তিশালী দেশ গঠনে সহায়ক হয়েছে। এছাড়াও মোদীর তিন সদস্যের আর্থিক উপদেষ্টার একটা উপদল রয়েছে। যাঁর মধ্যে আছেন বিবেক দেবরায়, ওয়ার্ল্ড ইকোনমির তরফে সম্মানিত অর্থনীতিবিদ সঞ্জীব সান্যাল ও বিশিষ্ট অর্থনীতিজ্ঞ শেরপা অমিতাভ কানত।

এছাড়া আরও দুজন বিশিষ্ট আমলা রয়েছেন নরেন্দ্র মোদীর দলে। একজন অমিত খাঁড়ে, যিনি বিহারে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি সামনে আনেন। অন্যজন তরুণ কাপুর, মোদীর উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার আগে পেট্রোলিয়াম-সচিবের দায়িত্ব সামলেছেন।

এখন প্রশ্ন, কী করে এমন নিজস্ব দল তৈরি করলেন মোদী? তথ্যাভিজ্ঞমহল বলেছেন, রাজনৈতিক রং কিংবা অনুগত্য দেখে তাঁর এই দল সাজাননি প্রধানমন্ত্রী। তাঁর টিমে প্রথম থেকে একটা বিষয়ই কেবল গুরুত্ব পেয়েছে, সেটা হলো দেশের স্বার্থ। আর এই স্বার্থ রাজনীতি-ব্যতীত বিভিন্ন পেশার যেমন কূটনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, আমলা, নিরাপত্তা-বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি সফল মানুষদের এক ছাতের তলায় এনে ভারতকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। □

কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে আন্তরিক হতে হবে সবাইকে

সুকল্প চৌধুরী

জম্মু ও কাশ্মীরের মাটি আক্ষরিক অর্থেই চেনেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শুভাশিস সেন। বিশ্বের অন্যতম বিবদমান ভূমিখণ্ড কাশ্মীর উপত্যকা তার মতো সামগ্রিক ভাবে সম্ভবত অনেকেই জানেন। চলতি মাসের ৪ তারিখ তিনি তাঁর ৫৪তম জন্মদিন এবং শততম কাশ্মীর যাত্রা পালন করলেন বারামুলায়। কাশ্মীরের উগ্র ধর্মান্ধ জেহাদি জঙ্গি, সাধারণ মানুষ, সরকারি আধিকারিক, সেনা, পুলিশ থেকে শুরু করে তাঁর পরিচিত বন্ধুর সংখ্যা সীমাহীন। যদিও এই 'বন্ধুত্ব' অর্জন করতে তাঁর অনেকটাই সময় লেগেছে। কাবাইলি, পাশতুন, পস্তু, উর্দু ভাষায় পারদর্শী কাশ্মীর অন্তপ্রাণ এই মানুষটির চরম আক্ষেপ মাত্র একজন, শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির ভুল সিদ্ধান্তের জন্য জম্মু-কাশ্মীর-লাদাখ হাজারো সমস্যায় জর্জরিত ছিল। শুধু উপত্যকাই নয় গোটা দেশে এর প্রভাব পড়েছে। যার ফলশ্রুতি হলো সারা দেশের উন্নয়ন ও শান্তির উপরে ক্রমাগত আঘাত এসেছে।

জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে অনেক দিন থেকে অনেক কথা বলা হয়েছে, অনেক লেখা হয়েছে, অনেক কাশ্মীর বিশেষজ্ঞ তৈরি হয়েছেন, এমনকী অনেকেই থিসিস পেপার জমা দিয়ে নামের আগে ডক্টর লিখছেন। কিন্তু সব প্রশ্ন কি শেষ হয়েছে? সকলেই জানেন বস্তুত ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের প্রাণঘাতী আলোচনার সময় থেকেই মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলি কোন দেশে যাবে তাই নিয়ে টানাপোড়েন ছিল। এই কারণে সীমাহীন হিন্দু হত্যা, অসংখ্য হিন্দু নারী ধর্ষণ, সম্পত্তি লুট, দেশান্তর হয়েছে। ডোগরা রাজা হরি সিংহের রাজ্য অবিভক্ত কাশ্মীর উপত্যাকায় ৭০ শতাংশ ছিল মুসলমান। তাই অনেকেই হয়তো ভেবেছিল উপত্যকা পাকিস্তানেই যাবে। দেশ ভাগের সময় ছোটোবড়ো মিলিয়ে ৫৪৯টি ব্রিটিশ করদ রাজ্য ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। বাকি ৩৯টি রাজ্য পাকিস্তানের দিকে যায়। বলা ভালো প্রথম দিকে ভারতের সঙ্গে ১৪৩টি করদ রাজ্য যুক্ত হতে চায়নি। তারা চেয়েছিল স্বাধীন ভাবে নিজেদের মতো থাকতে। কিন্তু সদ্য স্বাধীন দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বুঝিয়ে বাস্তব পরিস্থিতির কথা বলেন এবং কিছুটা শক্তি প্রয়োগ করে তাদের ভারতভূমির অংশ করে নেয়। সকলেই জানেন জুনাগড়ের নবাব, হায়দরাবাদের নিজাম ও কাশ্মীরের রাজা ভারতে যোগ দেয়নি। ভারতভুক্ত হয়নি কোচবিহারও। একমাত্র কাশ্মীর বাদে বাকি সব ব্রিটিশ করদ রাজ্যকে ভারতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন বল্লভভাই। তিনি হায়দরাবাদে সেনা পাঠিয়েছিলেন এবং কোচবিহারের মহারাজা জগৎ দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছিলেন। ১৯৫০ সালের প্রথম দিন থেকে কোচবিহার এই রাজ্যের একটি জেলায় পরিণত হয়।

কাশ্মীরে কেন সর্দার নজর দেননি। মহারাজা হরি সিংহ ও ভারত সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ও নেহরুর আস্থাভাজন আমলা নয়াদিল্লির প্রতিনিধি ভিপি মেনন লিখিত 'ইন্টিগ্রেশন অব দি ইন্ডিয়ান স্টেটস' বইতে আছে কাশ্মীরের ভূমিপুত্র বলে দাবি করা জওহলাল নেহরু চেয়েছিলেন তিনি নিজেই এই বিষয়টি দেখবেন। স্বাধীনতার সময় ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশই কাশ্মীরকে নিজেদের ভেতর চেয়েছিল। কিন্তু রাজা হরি সিংহ তাঁর মুসলমান প্রজাদের ভয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। তিনি স্বাধীন দেশ হিসেবে কাশ্মীরকে ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানের সর্বময় কর্তা জিন্না কাশ্মীরের উপজাতি গোষ্ঠী কাবাইলিদের সামনে রেখে পাক সেনাদের দিয়ে কাশ্মীর আক্রমণ করায়। কাবাইলিরা প্রচুর পরিমাণে ভেড়া, ছাগল, দুম্বা সামনে রেখেছিল। তাই হরি সিংহের সেনারা প্রথমে পাক আক্রমণের বিষয়টি বুঝতে পারেনি। হরি সিংহ ভারতীয় সেনার সাহায্যে জম্মুতে পালিয়ে আসেন। তিনি ১৯৪৭ সালে ২৬ অক্টোবর ভারত ভুক্তির চুক্তিতে সই করেন।

এইসব ইতিহাস সকলের জানা। লে: জেনারেল জয়ন্ত নারায়ণ চৌধুরীর সামগ্রিক পরিকল্পনায় কর্নেল দিওয়ান রণজিৎ রায়ের নেতৃত্বে ভাতীয় সেনা পাক সেনাদের কাশ্মীর উপত্যকা থেকে প্রায় হঠিয়ে দিয়েছিল। এই সময় প্রায় শেষ লগ্নে কাউকে না জানিয়ে একক সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আচমকাই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেন। রেডিয়ো স্টেশন থেকেই জেনারেল চৌধুরীকে নেহরু ফোন করে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলেন। জেনারেল চৌধুরী মাত্র এক ঘণ্টা সময় চেয়েছিলেন। প্রায় ২০ মিনিট ধরে প্রধানমন্ত্রী ও সেনা নায়কের ভেতর বাকযুদ্ধ চলে। প্রায় কিন্তু প্রবল 'শান্তিকামী' এবং 'পাক সেনাদের রক্তপাতে রাতের ঘুম হারা' নেহরু কোনও কথাই শুনতে চাননি। ভারতীয় সেনা যুদ্ধ থামিয়ে দেয়। কিন্তু উপর থেকে নির্দেশ এলেও জেনারেল চৌধুরী পাক সেনাদের হটিয়ে দেওয়া জায়গা ভারতীয় সেনাকে ছাড়তে দেননি। যুদ্ধ বন্ধের খবর পেয়ে প্রবল উল্লাসে ঝিলমের ওপার গজরা থেকে পাক সেনা বর্তমান এলওসি-তে ফিরে আসে। পাক আক্রমণে সায় ছিল ভারত-পাকিস্তানের সুপ্রিম কমান্ডার জন অ্যাকেলেড ও গর্ভনর জেনারেল মাউন্ট

ব্যাটেনের। তারা জানতেন এই যুদ্ধের ফলে ক্ষতি হবে পাকিস্তানের।

নেহরু কেন এমন করলেন, অধ্যাপক সুভাশিস সেন মনে করেন নেহরুর মনে হয়েছিল তাঁর সাধের ভাই বেরাদররা তাঁর উপর ক্রমেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। কারণ পাক হানাদার নিধন বা পাকিস্তানের পরাজয় তাঁরা মেনে পারছিল না। শোনা যায় সান্ধ্যকালীন আসরে নেহরু- বান্ধবী লেডি মাউন্টব্যাটনের বিশেষ অনুরোধ ছিল পাকিস্তানের ক্ষতি না করতে। নিয়ম অনুসারে যুদ্ধবিরতির জন্য ক্যাবিনেটের মিটিং করা হয়নি। একা নেহরু যুদ্ধ বিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে অনেকেই বলেন, আবুল কালাম আজাদ ও মহম্মদ হবিবুল্লহ বিষয়টি জানতেন। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী দিল্লিতে থাকলেও তাঁদের অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, চরম হঠকারী আরেকটি সিদ্ধান্ত হলো যুদ্ধে জেতা বিষয়কে রাষ্ট্রপুঞ্জে নিয়ে যাওয়া। অধ্যাপক সেন মনে করেন, উপত্যকা থেকে পাক সেনা সরিয়ে দিলে ভারতীয়রা খুশি হতেন এবং সেটাই সঠিক সিদ্ধান্ত হতো। কিন্তু নেহরুর দেশবাসীর থেকেও বড়ো ভাবনা ছিল পাকপন্থী মুসলমানদের কাছে জনপ্রিয়তা হারানো। বল্লভভাই যুদ্ধ বিরতি ও রাষ্ট্রপুঞ্জে যাওয়া দুটিরই বিরোধিতা করেছিলেন।

পরবর্তী সময়ে অবসরের পর জেএন চৌধুরী প্রকাশ্যে নেহরুর সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছিলেন। ফলশ্রুতি ছিল, এই সেনা নায়কের রহস্য মৃত্যু। অধ্যাপক সেন আরও একটি প্রশ্ন তুলেছেন, হরি সিংহ শ্রীনগর থেকে চলে আসার সময় ৯টি সিন্দুক বোঝাই অলংকার এনেছিলেন সেগুলি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজের হেফাজতে রেখেছিলেন নেহরু। সেগুলির কী হলো? হরি সিংহ পুত্র তথা কংগ্রেস নেতা করণ সিংহ সেই প্রশ্ন তুলেও জবাব পাননি। আরেকটি প্রসঙ্গ তোলাই যায়, দেশ ভাগের পর ভারতের পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ছিল। এই টাকা প্রদানে সর্দারের আপত্তি ছিল, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই টাকায় পাকিস্তান অস্ত্র কিনবে। বলা হয় মহাত্মা গান্ধীর চাপে এই টাকা জিন্নাকে দিতে বাধ্য হয় ভারত। সেই টাকা দিয়ে পাকিস্তান অস্ত্র কিনে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

রাজা হরি সিংহের সঙ্গে নেহরু সরকারের কাশ্মীর চুক্তি অনুযায়ী প্রতিরক্ষা, বিদেশ ও যোগাযোগ এই তিনটি বিষয় বাদ দিয়ে বাকি কোনও ক্ষেত্রেই ভারত সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারত না। ৩৭০ ধারা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সকলেই সেগুলি জানেন। এই ৩৭০ ধারা বিলোপের পর কাশ্মীরিদের আত্মঅধিকার নিয়ে মহান দেশভক্তরা বিলাপ করছেন। এখন তাঁদের কাছে প্রশ্ন বিগত ৭৫ বছরে কাশ্মীরের জনগণ কী পেয়েছেন? উপত্যকার বাইরের মানুষ জানেন, আক্ষরিক অর্থেই কাশ্মীর ভূস্বর্গ, সেখানে আপেল, উইলো কাঠ, বাহারি কাজের চাদর-শাল, বিভিন্ন মশলা মেলে। আর বলিউডের সিনেমার চোখে কাশ্মীরকে চেনে সবাই। বিগত ৩০ বছর ধরে কাশ্মীর ভয়ের জায়গা। পাক ও বিভিন্ন মোল্লাবাদী মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা খুন, রক্তপাতের মিলিত চেহারা হলো কাশ্মীর। লাদাখ বা জম্মুর বড়ো একটা অংশের সঙ্গে যার মিল নেই। অধ্যাপক সেনের মতো ভারতবাসীর প্রশ্ন, মোল্লাবাদী মুসলমানদের সন্তুষ্ট করতে গিয়ে নেহরুর একক হঠকারী সিদ্ধান্তের জন্য কাশ্মীরবাসীরা চরম অনিশ্চিত জীবনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আর কতদিন এবং কেন তাঁদের এই জীবন চলবে? প্রকাশ্যে পাক সমর্থক শেখ আবদুল্লা, ফারুক আবদুল্লা, মুফতি এবং কংগ্রেসের কিছু পরিবার বিভিন্ন ভাবে উপত্যকাকে ছিবড়ে করে বড়োলোক হয়েছে। কংগ্রেস বা আবদুল্লারা কোনও দিনও কাশ্মীরি মুসলমানদের মন থেকে ভারত বিদ্বেষ দূর করার চেষ্টা করেনি। পাশাপাশি নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখনই কাশ্মীর সমস্যার কথা ভাবেনি। ২৩ টাকা কিলো দরে বাসমতী চাল, ১২ টাকা চিনি, ৮ টাকা গম, ২৫০ টাকায় গ্যাসের সিলিন্ডার, ২০ টাকায় কেরোসিনের বিনিময়ে ভারতীয় সেনাদের দিকে ধেয়ে এসেছে পাথর, গুলি, লাথি আর বিতাড়িত হতে হয়েছে ভূমিপুত্র পণ্ডিতদের।

বর্তমানে কাশ্মীরের পরিস্থিতি অনেকটাই ভালো বলে মনে করেন অধ্যাপক সেন। তাঁর অভিজ্ঞতা, পথ চলা এখনও বহু বাকি। এখনও উপত্যকার গ্রামাঞ্চলের ভেতরে একা যাওয়া যায়। সন্দেহের দৃষ্টি এলেও নিশ্চিতভাবে গুলি আসার সম্ভাবনা কমেছে। ৩৭০ ধারা বিলোপের পর এখনও পর্যন্ত চারটি বড়ো বেসরকারি হাসপাতাল, ছয়টি মাঝারি শিল্প সংস্থা, বেশ কিছু শপিং মল স্থাপিত হয়েছে। সিনেমা হল খুলছে। মানতেই হবে, উপত্যকার বেশিরভাগ মানুষ এখনও ভারত ভূমিকে বিদেশ বলে মনে করেন। লাগাতার পাক ও বিভিন্ন জঙ্গি মোল্লাবাদী সংগঠনের প্রচার, অস্ত্র জোগান, অর্থ প্রদান, জঙ্গি প্রশিক্ষণ, অনুপ্রবেশ চলছে। পাশাপাশি কংগ্রেস, মেহবুবা, আবদুল্লা, সুযোগসন্ধানী অতি বামেরা, অন্ধ নেহরু ভক্তরা, তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠন, শহুরে নকশাল এবং লোক দেখানো উদার হিন্দুদের 'আন্তরিক প্রয়াস' কিছু কম নেই। পাকিস্তান বা মধ্যপ্রাচ্যের জঙ্গি সংগঠনগুলি তাদের অন্তর্ঘাত চালিয়ে যাবেই। কিন্তু ভারতীয়রা কেন মুসলমান তোষণ ছাড়বে না, তারা কেন কাশ্মীর সমস্যার যথাযথ প্রয়াস করবে না। এমনটাই অধ্যাপক সেনের ভাবনা। এই ভাবনা কেবল তাঁর একার নয় সমস্ত প্রকৃত ভারতবাসীর ভাবনা।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বলেই দিয়েছেন, সেনা প্রস্তুত, আদেশ পেলেই নেহরুর হঠকারিতায় পাকিস্তানের হাতে থাকা বাল্টিস্তান, গিলগিট দখল করে নেবে ভারত। সেনা নায়ক জয়ন্ত নারায়ণ চৌধুরীর উত্তর পুরুষরা মনে করেন এভাবে নেহরুর মুসলমান প্রীতির জবাব দেওয়াই যায়। কিন্তু অশান্তি হয়তো থেকে যাবে। তার থেকে অনেক সহজ তোষণ ও স্বার্থ ভুলে সব ভারতীয়রা এগিয়ে এলে গোটা সমস্যার সমাধান নিশ্চিত ভাবে হবে। সিপিআইয়ের এক সময়কার সদস্য তথা বাম সমর্থক বলে গর্বিত ও ঘোর বিজেপি বিরোধী অধ্যাপক সুশোভন সেনও মনে করেন তোষণকারী, শহুরে নকশাল, মেকি বামপন্থীরা, সেকুলার হিন্দুরা একবার এগিয়ে আসুক না, নিশ্চিত ভাবে তারা সমাজের কাছে আরও উঁচু জায়গা পাবেন। □

ভারতের শিক্ষা ও অর্থনীতিতে নেহরুর দুই ভুল

নিখিল চিত্রকর

বলা হয় ভারতের ফরেন পলিসি নিয়ে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর দেখানো পথই অনুসরণ করে চলেছেন তাঁর উত্তরসূরীরা। তথাকথিত নেহরুপন্থীরা আবার আরেক ধাপ এগিয়ে বলেন চাচা নেহরুই নাকি ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করতে নানারকম ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিলেন। যদিও ইন্দো-চীন যুদ্ধের পর চীনাদের আকসাই চীন উপহার দেওয়া,কাশ্মীরের ব্যবচ্ছেদ, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির বছরেই কাশ্মীরের মীরপুরে প্রায় ২৫ হাজার হিন্দু ও শিখ হত্যার পরেও মৌনতা অবলম্বন এবং জম্মু-কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদানের সিদ্ধান্তগুলি 'নেহেরওয়ালে বাবু'র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার ধারণার পরিপন্থী বলেই প্রমাণিত হয়। পণ্ডিত নেহরুর এই সমস্ত সিদ্ধান্ত কতটা ভুল, কতটা ঠিক ছিল তা বিচার করার দায় নেহরু গবেষকদের। তবে একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে যে পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন তা ভারতকে পঞ্চাশটা বছর পিছিয়ে দিয়েছে।

উচ্চশিক্ষানীতির গলদ

স্বাধীন ভারতের সার্ভিস সেক্টরে (পরিষেবা ক্ষেত্র) ভারতের বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এদেশের উৎপাদনক্ষেত্রের (ম্যানুফাকচারিং সেক্টর) অবস্থা তথৈবচ। অথচ পড়শি দেশ চীনের ম্যানুফাকচারিং সেক্টর দারুণভাবে উন্নত। যেকারণে মেডিসিনের মতো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য রপ্তানিতে উন্নত দেশগুলিকে টেক্কা দিচ্ছে চীনা ড্রাগন। তাই আজও এমন বহু পণ্যের আমদানির জন্য চীনের ওপরেই নির্ভর করে থাকতে হয় আমাদের। দুটো প্রতিবেশী দেশ একই সময়ে শিক্ষা ও অর্থনীতি নিয়ে নীতি তৈরি করছে। অথচ চীন তার নীতি নিয়ে এগিয়ে গেছে, আর একটা দেশ সেই যে পিছিয়ে পড়ল, তার মাশুল গুনতে হচ্ছে আজকের প্রজন্মকেও। কেন? এর পিছনে অনেকগুলো সঙ্গত কারণের মধ্যে দুটো হলো, প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে নেহরু সরকারের উদাসীনতা ও আর্থিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপের অভাব।

জওহরলাল নেহরু সদ্য স্বাধীন হওয়া ভারতের মাথায় চাপিয়ে দিলেন তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রের ধারণা। তাকে অনুসরণ করে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তৈরি করলেন ভারতের শিক্ষা মডেল। যা নাগরিকদের উচ্চশিক্ষিত করবে, হোয়াইট কলার সার্ভেন্ট তৈরির অপশন দেবে কিন্তু শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করার উৎসাহ দেবে না। অথচ একই সময়ে চীন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মতো অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েও একেবারে গোড়া থেকে নাগরিকদের প্রাথমিক শিক্ষার ওপর জোর দিল। নেহরু সরকারের প্রাধান্য ছিল এদেশের উচ্চশিক্ষার উপর। যার ফলে সেইসময় ভারতে আইআইটি, আইআইএম এবং দিল্লি ইউনিভার্সিটির মতো বড়ো বড়ো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। দেশে প্রযুক্তিবিদ্, ডাক্তার, আমলা, বুদ্ধিজীবীদের মতো দক্ষতাপূর্ণ বৃহৎ সম্পদ গড়ে উঠলো। তাদের সবাই হোয়াইট কলার চাকুরিজীবী শ্রেণীতে নাম লেখালেন। আবার তাঁদের মধ্যে অনেকেই উচ্চমানের ভরতুকিযুক্ত শিক্ষালাভ করে বিদেশে পাড়ি দিলেন। সেই সময় চীন তার শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে নেক্সট জেনারেশনের ভিত মজবুত করায় বেশি নজর দিল।

১৯৫১ সালে ভারতের সাক্ষরতার হার ছিল চীনের থেকে বেশি। আর নারী শিক্ষায় ভারত-চীন তখন সমানে সমানে পাল্লা দিচ্ছে। এরপর মাত্র ১০ বছরে সমস্ত পরিসংখ্যান বদলে গেল। ১৯৬১ সালে চীনের সাক্ষরতার হার ৪০ শতাংশ পেরিয়ে যায়। ভারত পড়ে রইল ৩০

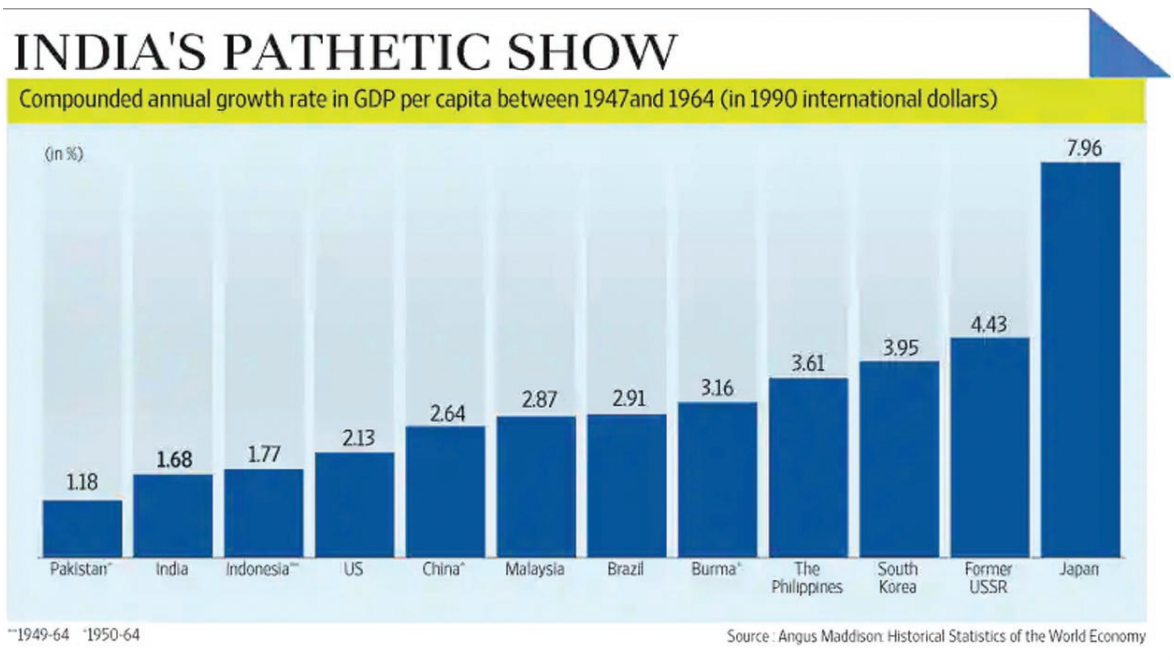

শতাংশের নীচে। কেন্দ্রীয় যোজনায় নেহরু অসংখ্য পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ তৈরি করেছিলেন। সেগুলো পরিচালনা করার জন্য ম্যানেজমেন্ট ও টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকের প্রয়োজন ছিল। তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিতেই নেহরু নজর দিলেন উচ্চশিক্ষার ওপর। সেই উচ্চশিক্ষার মডেল তৈরিতে মতামত নিলেন পরিসংখ্যানবিদ্ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের। সেই সময়ে দেশের শিক্ষাখাতের বেশিরভাগ অর্থ খরচ করা হতো সাদা কলারের ম্যানেজমেন্ট চাকুরিজীবী তৈরি করার পিছনে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটি ভীষণভাবে অবহেলিত হলো পণ্ডিত নেহরুর শাসনকালে।

অতএব নেহরুর ভারত পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজগুলোকে সচল রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাক্টরিগুলোয় মানব সম্পদ তৈরি করতে লাগল বেশি করে। যাতে সাদা কলারের চাকুরিজীবীর শূন্যস্থান ভরা যায়। সেই সময় ভারতের হোয়াইট কলার জব হোল্ডারদের ক্রাইটেরিয়া সম্পর্কে বলা হতো, 'few in numbers but skillful in nature required for service sector' অন্যদিকে উৎপাদন ক্ষেত্র(manufacturing)-কে ত্বরান্বিত করতে সম্পূর্ণ আলাদা পদক্ষেপ প্রয়োজন। এর জন্য অনেক বেশি সংখ্যক সেমি স্কিলড্ শ্রমিক দরকার। সেই সময়ে ভারতে টেক্সটাইল, খেলনা এবং আরও অনেক ক্ষুদ্র পণ্যের শিল্পের জন্য সরকারি উদ্যোগে এই সেমিস্কিলড্ শ্রমিক প্রশিক্ষণকে প্রায়োরিটির মধ্যে আনা প্রয়োজন ছিল। তা সম্ভব হয়নি উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য। তাই আমাদের দেশ উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যর্থতার ভার বয়ে নিয়ে চলেছে বহু বছর এবং বৃদ্ধি হয়েছে পরিষেবা ক্ষেত্রে।

অবশ্য আমাদের বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক পরিস্থিতির তুলনায় তখনকার ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। হয়তো পরিস্থিতি অনুযায়ী জওহরলাল নেহরু এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু সমকালীন পরিস্থিতিতে

Literacy Rates of India, 1951-2011

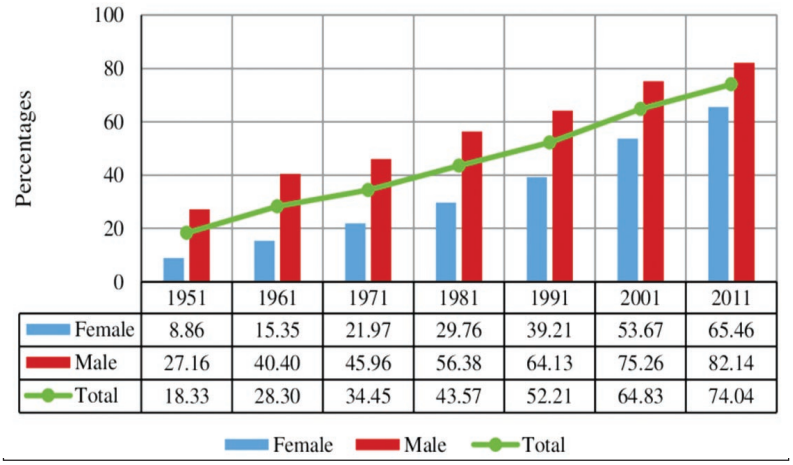

	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
Female	8.86	15.35	21.97	29.76	39.21	53.67	65.46
Male	27.16	40.40	45.96	56.38	64.13	75.26	82.14
Total	18.33	28.30	34.45	43.57	52.21	64.83	74.04

সমসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা যখন বেসিক এডুকেশন রাইটসকে প্রাধান্য দিয়ে দেশকে গতিশীল করার পথে হাঁটছেন সেই সময়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মডেল শিক্ষানীতি দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে পঞ্চাশ বছর। এটা ভুল নয় তো কী?

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ব্যর্থতা

একটা সময় ভারতকে বলা হতো 'সোনে কী চিড়িয়া'। অবশ্যই তখন ভারত শাসন করতেন হিন্দুশাসকরা। তারপর ভারতের ধারাবাহিক বৃদ্ধি যখনই হ্রাস হয়েছে একদল মানুষ আঙ্গুল তুলেছে হিন্দু ও তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসের দিকে। এমনকী তারা ভারতের দুর্বল বৃদ্ধির হারের নামকরণ করত হিন্দুত্বের নামে। আসলে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির জন্য নানাভাবে দায়ী করা হয়েছে হিন্দুদের। স্বাধীনতার পরপরই হিন্দুধর্মের উপর এমন ভিত্তিহীন অভিযোগের দরুনই হোক বা অন্য যেকোনও কারণেই হোক হিন্দু বৃদ্ধির হার কমতে থাকল ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সময়কালে। অদ্ভুতভাবে ওই সময়ে ভারতের তুলনায় পাকিস্তান দ্রুত হারে এগোচ্ছিল। এই ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে বিচার করতে বসলে কারও মনে হতেই পারে হিন্দুরা দেশের অগ্রগতি নিয়ে নিতান্তই উদাসীন এবং তাঁদের একরোখা মতবাদের জন্যই কখনও উন্নতি করতে পারে না এবং জিডিপিতে অবদান রাখতে পারে না।

প্রসঙ্গক্রমে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর নাম উঠে আসে। তিনি সমাজতন্ত্র পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হন। ভারতের অর্থনীতি ও তার পরিকাঠামো নিয়ে রাজাজীর চিন্তাধারা তাঁর সময় থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই তা পণ্ডিত নেহরু ও তার অর্থনৈতিক মতামতের বিপরীত মেরুতে বিচরণ করত। কার্যক্ষেত্রেও নেহরুর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতেন গোপালাচারী। নেহরুর লাইসেন্স পারমিট রাজ, সেন্ট্রাল প্ল্যানিং, পাবলিক সেক্টর, ক্লোজড্ ইকোনমি-সহ প্রায় প্রতিটি নীতির বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন আমলাতন্ত্রের আধিপত্যমুক্ত স্বাধীন বাজারভিত্তিক ভারতীয় অর্থনীতি। সি আর গোপালাচারী জানতেন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কিছু মানুষ মুনাফা ভোগ করেন আর বৃহত্তর অংশ চিরকালই দরিদ্র থেকে যায়। কংগ্রেস ও বামপন্থীরা মনে করে যে ভারতের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় অবশ্যই সমাজতন্ত্রী নীতি অনুসরণ করা উচিত। আর সেটাই চিরকাল প্রচার করেছে বাম ও কংগ্রেস। তাই মুক্ত অর্থনীতির কথায় এদের কোনও দিন সায় ছিল না।

জওহরলাল নেহরুর লক্ষ্য ছিল উন্নত ভারত গঠন। এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। তবে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য যে পথ তিনি নির্ধারণ করেছিলেন তা ছিল বিধ্বংসী। নেহরুর পরিসংখ্যানবিদ্- অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পিসি মহলানবিশের দেখানো পথেই সেসময় ভারতের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বাঁধার কাজ শুরু হয়েছিল। সেই সময়েই যদি ভারত লাইসেন্স পারমিটরাজ ছেড়ে মুক্ত বাজার অর্থনীতি অনুসরণ করত তাহলে ভারত আজকের পরিস্থিতির তুলনায় আরও বেশি উন্নত হতে পারত। সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া ভারতকে যেভাবে নেহরু সামলেছিলেন তা প্রশংসনীয়। ভারতের ইতিহাসে তাঁর অবদানও কম নয়। কিন্তু পণ্ডিতজীর ভুল শিক্ষানীতি ও অর্থনীতির জন্য ভারতের যে ক্ষতি হয়েছে, তার মাশুল গুনতে হচ্ছে আজও। □

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নেহরু কি উদাসীন ছিলেন?

পরাধীন ভারতে বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যেমন চিন্তাভাবনা খুব একটা হতো না, তেমনি সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের প্রাথমিক পর্বের শাসকেরাও তাঁদের ভাবনা চিন্তার মধ্যে আনতে চাননি বা গুরুত্ব দেবার কথা ভাবেননি বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থাকে।

স্বপন দাস

দেখতে দেখতে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পেরিয়ে এলাম। অনেকটা বছর পরাধীনতার গ্লানি কাটিয়ে উঠে আমরা, মানে ভারতবাসী মুক্ত বাতাসের স্বাদ নিতে পেরেছিলাম। এই স্বাদ কি ভালো হয়েছিল? না আগের স্বাদই ছিল আর আছেও? সেটা এত বছর পেরিয়ে আসার পরেও ভারতবাসীর কাছে আজও ধাঁধাঁর মতো রয়েছে। তার কারণ আর কিছুই নয়, স্বাধীনতা প্রাপ্তির গোড়ায় যারা ভারতের চালিকাশক্তি হিসেবে নিজেদের শাসন ক্ষমতায় এনেছিলেন, তারা কি ভারতের সাধারণ মানুষের চারিত্রিক, সামাজিক পরিস্থিতির বা বাস্তবের দিকে তাকিয়ে হাল ধরে এগিয়েছিলেন? নাকি মানুষকে একটা ঘোরের মধ্যে রেখে, আবেগকে হাতিয়ার করে অবাস্তবের একটা ক্যানভাস আকার চেষ্টা করার চেষ্টা করছেন। আর সেই চেষ্টাতেই তারা জানতে পারছেন, আর মেলাবার চেষ্টা করে, তুলনার মাপকাঠিতে মাপার চেষ্টা করে চলেছেন। তার ফলাফলটা খুব একটা সুখকর হয়ে তাঁদের কাছে প্রকাশ পাচ্ছে না। আর সেটাই একটু শিক্ষিত মানুষের কাছে একটা ভয়ানক সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে। সেই প্রবাদটা তারা মাথায় আনছেন— যার গোড়ায় গলদ, তার আগাতেও গলদ থাকতে বাধ্য। হাজার চেষ্টা করলেও সংশোধন করা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়।

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সেদিন কিছু অশীতিপর মানুষের আড্ডা শোনার সুযোগ হয়েছিল ঘটনাচক্রে। আজকের, মানে ২০২২-এর একেবারে শেষ লগ্নে এসে, তাঁরা ফিরে দেখার চেষ্টা করছিলেন স্বাধীনতা

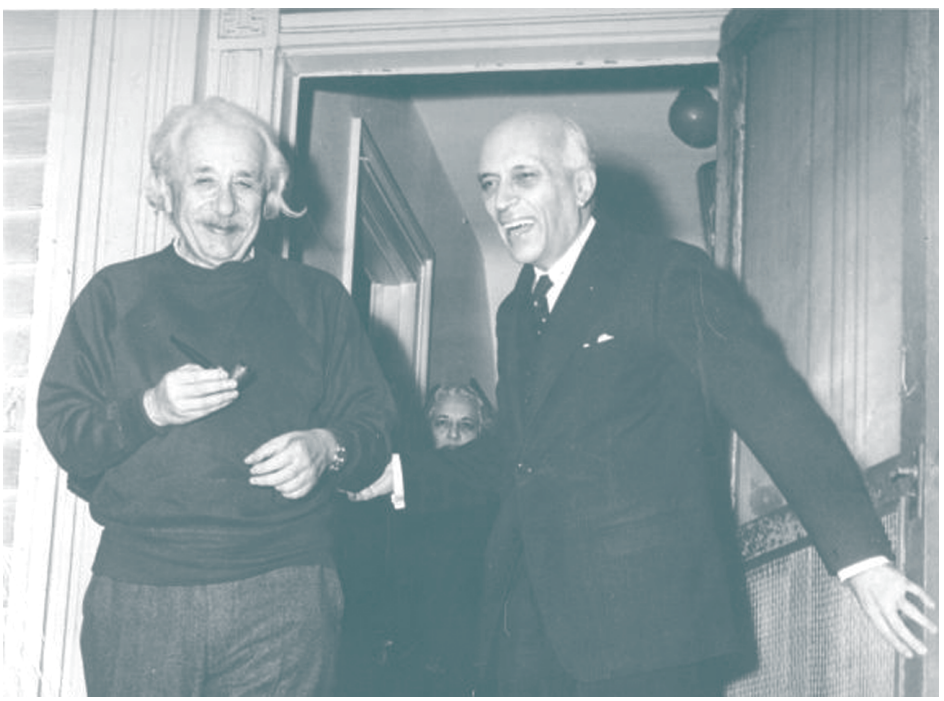

পাবার সময়ে কী অবস্থা ছিল আমাদের বুনিয়াদি সমেত সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায়? আর স্বাধীনতা পাবার পর সংবিধান রচনা হয়ে গিয়ে, সেটা প্রয়োগ করার সময়ে, অর্থাৎ ১৯৫১ সালে সাক্ষরতার হার কেমন ছিল, সেই পরিসংখ্যান উঠে আসছিল বারে বারে। একবার দেখে নেওয়া যাক সেই সময়ে আমাদের দেশে শিক্ষার হার কেমন ছিল? ১৯৫১ সালের পাওয়া একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশে সেই সময়ে সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ১৮.৩ শতাংশ। ভাবলে অবাক হতে হয়, এর মধ্যে পুরুষদের মধ্যে সাক্ষর ছিলেন প্রতি একশো জনে মাত্র ২৭.২ শতাংশ, আর মহিলা ছিলেন মাত্র ৮.৯ শতাংশ। তখন স্বাধীনতার প্রাপ্তির চারটি বছর কেটে গেছে। সেই সময়ের শাসক শ্রেণী কতটা তৎপর ছিল এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার? সেটা কিন্তু সেই সময়ে জওহরলাল নেহরু সরকারের কাছে সাক্ষরতা বাড়াবার জন্য যেটা দরকার, সেই

সঠিক পরিকল্পনার একটু হলেও খামতি ছিল বলে মনে করেন অনেকেই।

ভারতবাসীকে ন্যূনতম শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতেই যে আমাদের দেশ ধীরে ধীরে সামাজিক উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে, একথা বারে বারেই বলেছিলেন গান্ধীজী। তিনি বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থার ওপর জোর দিতে বলেছিলেন। কেননা তিনি বুঝেছিলেন, সাধারণ মানুষ যদি ন্যূনতম শিক্ষাটাও পায়, তাহলে অনেক কিছুই তাঁদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। আর এই বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা যত শক্তিশালী হবে, ততই উচ্চতর শিক্ষাদানের ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এটা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ব্রিটিশ আমলে ভারতবাসীকে অশিক্ষিত করে রেখে শোষণ যন্ত্রে নিষ্পেষণ করার যে চেষ্টা হয়েছিল, তার থেকে বেরিয়ে এসে নতুন আলোয়, নতুন সমাজ গঠনের একটা চেষ্টা করার জন্যই যে বুনিয়াদি শিক্ষা দানের অপর জোর দিতে হবে, সেই বিষয়টাই।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ের কথা এই প্রসঙ্গে আনতেই হয়। ঔপনিবেশিক শক্তি যখন আমাদের দেশের দখলদারি নিল, তাঁদের লক্ষ্য ছিল ব্যবসা আর পরোক্ষে ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন। ভারতের সাধারণ মানুষ ছিল তাঁদের কাছে অনেকটা অশিক্ষিত পশুসুলভ। তাঁদের হাতে শাসন ক্ষমতা গেলেও তারা সামান্যতম চেষ্টাও করেনি বা ভাবার চেষ্টা করেনি, এমন কোনো নীতি বা পরিকল্পনা নিতে যাতে ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটে। তাঁদের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে উচ্চ বর্গে যে সব মানুষদের যুক্ত করতেন, সেই শ্রেণীও চাইত যে শিক্ষার হার মানে শিক্ষিত মানুষের হার যাতে না বাড়ে। এরই মধ্যে মিশনারিরা এল। আর তাঁদের মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষার একটা ধারা প্রচার হতে শুরু করল। মূল উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রচার প্রসার। আর শাসককুলের কাছে কিছু মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের ব্যবসাতেও যাতে ওই সব মানুষকে কাজে লাগানো যায়। আর প্রশাসনিক কাজেও যাতে সাহায্যের হাত পাওয়া যায়। এ ভাবনা থেকেই শুরু হয়েছিল ক্যালকাটা মাদ্রাসা, বেনারস সংস্কৃত কলেজে, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, হিন্দু কলেজ, বেদান্ত কলেজ, বেথুন স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের। যাক সে কথা। একটা কথা পরিষ্কার যে পরাধীন ভারতে বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যেমন চিন্তাভাবনা খুব একটা হতো না, তেমনি সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের প্রাথমিক পর্বের শাসকেরাও তাঁদের ভাবনা চিন্তার মধ্যে আনতে চাননি বা গুরুত্ব দেবার কথা ভাবেননি বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থাকে।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর দেশের প্রধানমন্ত্রী হন জওহরলাল নেহরু। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪ ছিল তাঁর শাসনকাল। ভারতের প্রথম নির্বাচিত (১৯৫২-র নির্বাচনে নির্বাচিত) শাসক দলের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তিনিই। একটি উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের থেকে আসা নেহরুর কাছে সাধারণ মানুষের উচ্চাশা ছিল অনেক। বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে। এর কারণ হিসেবে সেই সময়কার নানা বিষয় নিয়ে গবেষকরা যেসব মতের অবতারণা করেছেন, তাতে এমনটাই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি শাসন ক্ষমতায় এসেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিশুদের বিনাব্যয়ে শিক্ষার অধিকারের কথা আবশ্যিক বলেছিলেন, আর গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে এই বিষয়ে কয়েক হাজার বিদ্যালয় গড়ে তোলার কথাও বলেছিলেন। তা সত্ত্বেও দেখা গেছে তিনি এই বিষয়টার বাস্তবতাকে কেমন যেন একটু এড়িয়েই চলে গেছেন। তিনি জোর দিয়েছিলেন বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর। সেই সময়ে একের পর এক উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল। শুরু হয়েছিল অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সের। শুরু হয়েছিল ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনলজির। ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের সূচনা সেই সময়ের হাত ধরেই। সঙ্গে অবশ্যই ন্যাশনাল ইন্সটিটিউটের কথা বলতেই হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও সেই মতো বুনিয়াদি শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়নি। তিনি উচ্চ শিক্ষার মানের দিকে নজর দিলেও সিংহ ভাগ অশিক্ষিত ভারতবাসীকে ন্যূনতম শিক্ষা প্রদানের বিষয়টাতে সেই মতো জোর দেননি। তিনি জোর দিয়েছিলেন বিজ্ঞানের প্রসার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায়। আর জোর দিয়েছিলেন পাশ্চাত্যের ধাঁচে ইংরেজি শিক্ষায়। আধুনিক ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন পাশ্চাত্যের আলোয় আলোকিত হয়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারেও। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে, তাঁদের নিজের ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের অধিকারের ন্যূনতম সুযোগের রাস্তাও অনেকটাই ব্যাহত হয়েছিল এই কারণেই।

২০১১ সালে ডেকান হেরাল্ড পত্রিকার একটি প্রতিবেদন জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল নোবেল প্রাপক অমর্ত্য সেনের ওপর লেখা প্রতিবেদনে, সেখানে অমর্ত্য সেনের একটি বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি বলছেন, প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে নেহরুর উদাসীনতা দুঃখজনক। তিনি সেদিন এটাও উল্লেখ করেন যে যতটা উচ্চ শিক্ষার দিকে নেহরুর নজর ছিল, ততটাই নজরের বাইরে ছিল প্রাথমিক শিক্ষা।

এই সূত্র ধরেই উঠে আসে, গান্ধীজীর চিন্তাভারনার বিষয়টিও। গ্রামকে নিয়ে যে চিন্তা ছিল, গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সাধারণের মধ্যে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসার যে কতটা প্রয়োজন, কতটা জরুরি, সেটা স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়েই গান্ধীজীর উপলব্ধিতে এসেছিল, সেটা প্রথম শাসন ক্ষমতাধারীদের কাছে বারে বারেই তিনি বলেছিলেন। আর সেটা নেহরুর কাছে হয়তো গ্রহণযোগ্য হয়নি সেই সময়েই। ফলে একটু হলেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী সময়ে, যে সময়টাতে উঠে দাঁড়াবার সময়, সেই সময়টাতে ধাক্কা খেয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। এর দায় কি এড়াতে পারেন নেহরু? এই প্রশ্ন কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বছর পরেও দেখা দিচ্ছে। □

With Best
Compliments from -

A Well Wisher

মাদক জিহাদ বন্ধ করতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি একান্ত জরুরি

মাধবী মুখার্জি

বিগত এক দশকে ইসলাম ও জিহাদ পৃথিবীর সর্বাধিক চর্চিত বিষয় হয়ে উঠেছে। ইসলামি জিহাদের আধুনিকতম কৌশল হলো মাদক ও লাভ জিহাদ (Narcotic and love jihad)। ধর্ম জিহাদ, কর্ম জিহাদ পরকালের লোভে জিহাদ, অর্থ জিহাদ, ব্যবসা বাণিজ্যের জিহাদ, জমি জিহাদ, রাজনৈতিক জিহাদ, সমাজে বা দেশ বিদেশে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানোর লোভে জিহাদ, সর্বোপরি জন্নাতের লোভে জিহাদ। জিহাদ মানে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা।

আয়াতুল্লা খোমেইনির মতে, 'জিহাদের অর্থ হলো পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চল বিধর্মী কাফেরদের দখলে রয়েছে সে সমস্ত অঞ্চলকে ইসলামের পতাকাতলে আনা। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র কোরানের আইন বা কোরানের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই জিহাদের অন্তিম লক্ষ্য।

অন্যান্য জিহাদি কৌশলের চেয়ে বর্তমান সমাজপ্রেক্ষিতে অনেক বেশি সহজ ও নিরাপদ হলো মাদক ও লাভ জিহাদ। অর্থাৎ হিন্দু বিনাশের জন্য রণকৌশল।

মাদক ও লাভ জিহাদের মাধ্যমে ইসলামি কট্টরপন্থীদের নিশানায় রয়েছে ১২ থেকে ২০ বছরের হিন্দু অথবা অমুসলমান মেয়েরা। মাদক-লাভ জিহাদের পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করার জন্য ভালোবাসা বা প্রেমের অভিনয়ের ছদ্মবেশে অথবা অন্য কৌশলে হিন্দু মেয়েদের ধর্মান্তরিত করে ক্রমাগত তাদের মগজ ধোলাই করে নিজের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। বিভিন্ন উপায়ে হিন্দু সমাজ ধ্বংসের ভয়ংকর কৌশল হলো এই ধরনের নিঃশব্দ সন্ত্রাস।

বর্তমান সমাজপ্রেক্ষিতে লাভজিহাদের পরিবর্তিত রূপ মাদক (নারকোটিক) জিহাদ। মাদকের বিক্রি বৃদ্ধি প্রমাণ করে দিচ্ছে মাদক (ড্রাগস) জিহাদ কতটা বেড়ে গিয়েছে। সুকৌশলে মাদক খাইয়ে হিন্দু যুবক-যুবতীর জীবন নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে।

কট্টরপন্থীদের মতে ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করা

সম্ভব নয়। সেটা ওরা খুব ভালোভাবে বুঝে গিয়েছে। সে কারণে ধর্মীয় জনবিন্যাসে দ্রুত পরিবর্তন আনা আর একাধিপত্য স্থাপন করার উদ্দেশ্যে মাদক ও লাভজেহাদের মতো অস্ত্র ব্যবহার নিরাপদ। যেখানে অস্ত্রের প্রয়োগ করা হয় না সেখানে মাদক ব্যবহার করা হয়, যার শিকার হচ্ছে হিন্দু মেয়েরা। এই রাজ্যে ও এই প্রকার কিছু সন্ত্রাসী সমাজ বিরোধী চক্র সক্রিয়।

আমাদের একটা জাতীয় ভয়ংকর সমস্যা 'মাদক' যার পরিবর্তিত রূপ 'মাদক জিহাদ'। এটি শুধু ব্যক্তির ক্ষতি করে না, বরং এর দ্বারা সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সামাজিক নিরাপত্তা, পারিবারিক বন্ধন, অর্থনীতি, সর্বোপরি মনুষ্য জীবন বিপদাপন্ন। এটি এক নিঃশব্দ সন্ত্রাস। সেকারণে দেখা যায় যে অবাধে সন্ত্রাসীরা মাদক ব্যবসার পরিসর বিস্তৃত করছে এবং তাদের এরূপ জঘন্য অপকর্মের শিকার হচ্ছে নিরীহ হিন্দু অথবা অমুসলমান তরুণ প্রজন্ম। স্কুল, কলেজ, হোস্টেল, জিম, পার্লার, বিউটিপার্লার- সহ বেশকিছু শপিংমল ও সফট্ ড্রিংকসের দোকানের অন্তরালে চলছে মাদকের রমরমা কারবার। ঠাণ্ডা পানীয়তে মাদক মিশিয়ে মাদকাসক্ত করা হচ্ছে। এই নিঃশব্দ সন্ত্রাসের শিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্কুল কলেজের টিনেজার হিন্দু মেয়েরা। বয়স কম হওয়ার জন্য তাদের সঠিক বিচার করবার ক্ষমতা সেই মুহূর্তে থাকে না। মিথ্যে ভালোবাসার জালে ফাঁসিয়ে, সুন্দর সুন্দর উপহার দিয়ে তাদের মন মানসিকতা পালটে দেওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়। এই বাস্তব সত্য ইতিমধ্যে সকলেরই জানা। কম বয়সিদের বোঝানো খুব সহজ। 'সবচেয়ে খেতে ভালো শিশুদের মস্তক'। সন্তানকে

ভালো কিছু উপহার দিলে বাবা-মায়েরা যথেষ্ট খুশি হয়। এই অল্পে খুশি হওয়ার কারণটা খুব ভালোভাবে সুকৌশলে জিহাদিরা কাজে লাগাচ্ছে।

মাদক (ড্রাগ) জিহাদ প্রাথমিকভাবে অনেকে স্বীকার না করলেও আসলে এটা যে ভালোবাসার নেপথ্যে হিন্দু মেয়েদের ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া সেটা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। সামাজিক শিক্ষার সঙ্গে এরূপ জিহাদি কার্যকলাপের সঙ্গে আমাদের আগামী প্রজন্মকে সচেতন করা আজ অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। মাদক জিহাদ যে কতটা ভয়ংকর রূপ নিয়েছে সেটা আজ খুব স্পষ্ট। মাদক সন্ত্রাস রুখতে কঠোর থেকে কঠোরতম আইন আনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

বর্তমানে একটি বিষয় ব্যাপকভাবে লক্ষণীয় মাদক লাভ জিহাদে। মাদকসেবী যুবক-যুবতীরা 'কিশোর গ্যাং' গড়ে তুলেছে যাদের প্রত্যেকের বয়স ১২ থেকে ২০ এর মধ্যে এবং তারা এক সঙ্গে মিলে নানারকম অন্যায় অপরাধে জড়িত। এমনকী তারা খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, অপরাধে লিপ্ত।

শিক্ষা ও শান্তির নগরী হিসেবে খ্যাত দার্জিলিং, শিলিগুড়ি এসব কিশোর গ্যাংয়ের উত্তাপে উত্তপ্ত ও অশান্ত হয়ে উঠেছে। পরিণামে প্রতিনিয়ত কিছু কিশোরী মাদক জিহাদের শিকার হচ্ছে। অবাধে নেশা করার পাশাপাশি বেড়ে চলেছে দুষ্কর্ম। তারা দেশ ও জাতির জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পেছনে কারণ দেখতে গেলে দেখা যায় বড়ো বড়ো রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠেছে তারা। শুধু তাই নয়, রাজ্যের অনেক বড়ো নেতা, ব্যবসায়ীও মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা মানে জলে বসে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করার মতোই কঠিন।

এরূপ নিঃশব্দ সন্ত্রাসের মাধ্যম সুপরিকল্পিত ভাবে মিথ্যে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে মাদকাসক্ত করে প্রথমে ধর্ষণ, পরে ধর্মান্তকরণ ও নিকাহ। কোনো হিন্দু মেয়ে যদি ধর্ম পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুসলিম পরিবার হিন্দু মেয়েটিকে মেনে নেয় না। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে যায়। পরিস্থিতির চাপে পড়ে ধর্ম পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়।

ধর্ম পরিবর্তনের ঘটনার প্রতিবাদ হলে আমাদের সমাজে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে আসে নিকাহ অর্থাৎ সেই বিবাহের পক্ষে। তাদের কথায় 'মাদক-লাভ জিহাদ' বলে কোনো শব্দ হয় না। এই সুশীল বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য হলো ভালোবাসার কোনো ধর্ম হয় না। যদি তাদের প্রশ্ন করা হয় ভালোবাসার কোনো ধর্ম না থাকলে শ্রাবণী ঘোষ থেকে মরিয়াম বিবি কেন হতে হয়?

অনেক সময় অন্তঃধর্মবিবাহের ক্ষেত্রে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট এড়িয়ে ধর্মীয় বিয়ের পথ বেছে নেয়। সাম্প্রতিক রাজ্যে এরকম শতাধিক ঘটনা আমাদের নজরে এসেছে। যেখানে হিন্দু মেয়েদের জোর করে প্রথমে ধর্ষণ পরে ধর্মান্তরকরণ করা হয়েছে। বলপূর্বক অন্তঃধর্মে বা ভিন্ন ধর্মে বিবাহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক অস্থিরতা দেখা যায়। এ ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি প্রতিহত করতেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ইদানীং পশ্চিমবঙ্গকে বৃহত্তর ইসলামি দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে আরব দেশ থেকে প্রচুর অর্থ আসে, যার সিংহভাগই বিলিয়ে দেওয়া হয় ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে মাদক-লাভজিহাদকে বাস্তবায়িত করবার লক্ষ্যে। বাকি খরচ হয় প্রচারমাধ্যমে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে। ভারতে প্রতিদিন হিন্দু সংখ্যা কমে যাওয়ার মূল কারণ লাভ-ড্রাগ জিহাদের সাজানো পরিকল্পনা। নিঃশব্দ সন্ত্রাস।

সম্প্রতি শিলিগুড়ির এক বিত্তবান এলাকার এক স্কুল ছাত্রীকে মাদকাসক্ত করে দিনের পর দিন ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে আশরনগরের এক মুসলমান যুবকের বিরুদ্ধে। যুবকটি তার নিজের ধর্মীয় পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রেখে নাবালিকার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে। যুবকটি তার বাবা মায়ের সহযোগিতায় মেয়েটির ধর্ম পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল বলে অভিযোগ করে নাবালিকার পরিবার। নাবালিকা এবং তার মায়ের জবানবন্দি থেকে উঠে এসেছে এক ভয়ংকর নিঃশব্দ সন্ত্রাসের কথা।

সুকৌশলে মুসলমান যুবক তার বাবা-মায়ের সঙ্গে পরিচয় করবার অজুহাতে নাবালিকাকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। আপ্যায়নের আড়ালে মাদক মিশ্রিত খাবার খেয়ে নাবালিকা অচেতন হলে সেই সুযোগে তাকে ধর্ষণ করে এবং নিজের মোবাইল ফোনে ছবি ও ভিডিয়ো সুরক্ষিত করে রাখে। তারপর সেই ছবি ও ভিডিয়ো দেখিয়ে বিভিন্নভাবে নাবালিকাকে ব্ল্যাকমেল করে বারবার ধর্ষণ করতে থাকে। আত্মগ্লানিতে তিন মাসের অন্তঃসত্তা অবস্থায় নাবালিকা আত্মহননের চেষ্টা করে। শারীরিক অবনতির কারণে নাবালিকাকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। দুর্ভাগ্যবশত বিনা চিকিৎসায় তাদের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পথ দেখানো হয়। যথারীতি চিকিৎসক এফআইআর রিপোর্ট না থাকার দরুন চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেন।

প্রথমে পুলিশ এফআইআর নিতে অস্বীকার করে। প্রশাসন চাপের মুখে পড়ে সাত ঘণ্টা পরে এফআইআর গ্রহণ করে। পরে চাপের মুখে মুসলমান যুবকের বাবাকে পুলিশ থানাতে বসিয়ে চা-বিস্কুট খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ ও শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতার সহযোগিতায় ছেলেটি ভিন্ন রাজ্যে পালিয়ে যেতো।

সাধারণত পরিবারে নতুন সদস্য আগমনের সংবাদে আত্মহারা হয়ে পড়ে পরিবার কিন্তু এক্ষেত্রে নাবালিকার পরিবারের কাছে বিড়ম্বনা ও অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে 'মাদক-লাভ' জিহাদের শিকার নাবালিকার গর্ভপাতের অনুমতি চেয়ে মহামান্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়। ২২ ডিসেম্বর ২০২১ নাবালিকার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে নথি আদালতে জমা দেওয়া হয়। সেই নথির উপরই সিদ্ধান্ত নেয় মহামান্য আদালত এবং অনুমোদন পাওয়ার পর নাবালিকার গর্ভপাত করানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন জেলাগুলোতে এ ধরনের সন্ত্রাস দিন দিন বেড়েই চলেছে। মাদক-জিহাদ এরূপ সামাজিক অবক্ষয়গুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কতটা জরুরি। অভিন্ন দেওয়ানি বিধিই লাভ-মাদক জিহাদের মতো কৌশলগুলিকে রুখতে পারে।

একশো দিনের কাজেও ব্যাপক দুর্নীতি

ভারতে ইউপিএ সরকারের আমলে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ছিল গ্রামের গরিব মানুষদের একশো দিনের কাজের কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প। সেই লক্ষ্যে ২০০৪ সাল নাগাদ সংসদে ও রাজ্যসভায় এই বিল পাশ হয় এবং প্রধানমন্ত্রী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প আইন তৈরি হয়। এই আইন অনুযায়ী গ্রামের কর্মহীন মানুষকে তার আবেদনের ১৫ দিনের মধ্যে কাজের ব্যবস্থা করতে হয়। দক্ষ ও অদক্ষ দু'ধরনের মজুরির ব্যবস্থা করা হয়। প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর ইউপিএ সরকারকে গ্রামের মানুষ দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেন।

এই প্রকল্পের দেখভালের জন্য বহু কর্মহীন যুবক-যুবতীকে কন্ট্র্যাকচুয়াল নিয়োগ করা হয়। পঞ্চায়েত থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত বহু অস্থায়ী কর্মী আছে। এই অস্থায়ী কর্মীদের বেতন কাঠামো ও ঘন ঘন বদলি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ ও অসন্তোষ আছে। মূলত প্রকল্পের সমস্ত কাজ রূপায়ণের জন্য একশো দিনের কাজে এই অস্থায়ী কর্মীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। কিন্তু এদের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসন বেতন নিয়ে নানা কারচুপি করছে। রাস্তাঘাট, পুকুরকাটা, জমি সমতলীকরণ, ড্রেন পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজ এই প্রকল্পের মাধ্যমে করা হয়। প্রথমদিকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু মাটিকাটা, রাস্তা তৈরি ও ড্রেন পরিষ্কার করা হতো। পরবর্তীতে উদ্যান পালন, কৃষিকাজ, আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরিতে লেবার সাপ্লাই—এইরকম অনেক জনমুখী কাজ যুক্ত করা হয়। প্রকল্পের মাস্টার রোল তৈরি, জব কার্ড এন্ট্রি বিবরণ,মাটি, রাস্তার মেজারমেন্ট, ছবি তুলে জিও ট্যাগ করা প্রভৃতি কাজ করেন পঞ্চায়েতের গ্রাম রোজকার সহায়ক। অথচ তাদের গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বরং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা-১ ব্লকের গ্রাম রোজকার সহায়কদের চার বছরের মধ্যে বদলি করে দেওয়া হলো। ন্যূনতম বেতন দিয়ে কাজ করানো হয়। বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির চাপে গ্রামের বিভিন্ন কাজে গরমিল ও কারচুপি হয়। এই প্রকল্পের দুর্নীতির কয়েকটা নমুনা আলোচনা করা যাক। ধরা যাক, পঞ্চায়েত সদস্য বা গ্রামের শাসকদলের নেতা তার পরিবারের সবার নামে জব কার্ড থাকবে কিন্তু কেউ ফিল্ডে কাজ করবে না। তারপর চারশো লেবারের মাস্টার রোল বেরোলে কাজ হবে দুশো লেবারের। ঢালাই রাস্তা হলে তার মাল-মেটিরিয়াল নিম্নমানের, রাস্তার মাপজোক নিয়েও বিস্তর অভিযোগ। কোনো কোনো জায়গায় পুকুর, ড্রেন, রাস্তার পরিকল্পনা ও টাকা বরাদ্দ হলেও বাস্তবায়িত না হওয়ার অভিযোগ। তাই অভিযোগগুলি সরেজমিনে তদন্ত করতে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল রাজ্যে এসেছেন।

এই প্রকল্পের কাজ করে বহু গরিব মানুষ রুজি রোজগার করেন। এই প্রকল্পের টাকা কেন্দ্র সরকার দেয় রাজ্যের মাধ্যমে। প্রকল্পের কাজ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা হয়। বিগত দশ বছর তৃণমূল সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পের কাজ নিয়ে বহু অভিযোগ উঠেছে। প্রকল্পের টাকা নিয়ে লাগামছাড়া দুর্নীতিও হয়েছে। খবরে প্রকাশ যে রাজ্যে সাড়ে চোদ্দ লক্ষ ভুয়ো জবকার্ড রয়েছে। এজন্যই তিন বছর এই প্রকল্পের বরাদ্দ টাকার অডিট রিপোর্ট রাজ্যের তৃণমূল সরকার কেন্দ্র সরকারের কাছে জমা করেনি। তাই কেন্দ্রীয় সরকার ৬ মাস ধরে প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে। প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। গ্রামের সাধারণ মানুষের হাতে কাজ নেই। টাকা নেই। তারা রাজ্য ও কেন্দ্রের নোংরা রাজনীতির শিকার হচ্ছেন। গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজগুলিও বন্ধ। ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। দীর্ঘ ৬ মাস সাধারণ মানুষের একশোদিনের মজুরি আটকে। কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না বলে রাজ্য সরকার প্রচার করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু হাইকোর্টে গিয়ে তদ্‌বির করছে না। অথচ, বিভিন্ন দুর্নীতি ও চুরির শাস্তি থেকে রেহাই পেতে কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে। গ্রামের মানুষের এবার সময় এসেছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নেবার। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন, সাধারণ মানুষ পরিশ্রম করে উপার্জন করে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চায়। তাদের সেই অধিকারটুকু কেড়ে নেবেন না।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
চন্দ্রকোনা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

অমূলক অভিযোগ

সন্দীপ চক্রবর্তীর অভিযোগ, জওহরলাল নেহরু একবার মুচলেকা দিয়ে ব্রিটিশের জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন এবং ওই ঘটনার কথা জওহরলাল তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থের 'প্রিলিউড টু নাভা' নামের অধ্যায়ে বিস্তারিত লিখে গিয়েছেন। কংগ্রেসি ও বামপন্থী ঐতিহাসিকেরা জওহরলালের জীবনের ওই সত্য ঘটনাটিকে সাভারকরকে নিয়ে তাঁদের ন্যারোটিভের আড়ালে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন— স্বস্তিকা, ১৫.৮.২০২২। নিবন্ধের শুরুতেই সন্দীপবাবু একটি মোটা দাগের ভুল করেছেন। জওহরলাল নেহরুর আত্মজীবনী গ্রন্থে 'প্রিলিউড টু নাভা' নামের কোনো অধ্যায় নেই; 'An Interlude at Nabha' নামের একটি অধ্যায় আছে। ওই অধ্যায়ে জওহরলাল নাভার ঘটনাবলী বিশদভাবে বলেছেন।

সন্দীপবাবু বলেছেন— নাভার বিক্ষুব্ধ শিখ সম্প্রদায় নবনিযুক্ত ব্রিটিশ প্রশাসকের বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলনে যোগ দিতে জওহরলালকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁর 'An Autography' গ্রন্থে জওহরলাল বলেছেন— আন্দোলনরত শিখেরা তাঁকে আমন্ত্রণ করেছিলেন সেখানকর পরিস্থিতি দেখতে যেতে ('...invited to go and see what heppened.')। মাত্র একদিনের ব্যাপার ছিল। নেহরুর কথায়— 'It meant the loss of only a lag to me; as gaito was near to Delhi...'। অর্থাৎ জওহরলালকে আন্দোলনে যোগ দিতে ডাকা হয়নি। সেখানে কারাদণ্ড ও কারামুক্তি প্রসঙ্গে আত্মজীবনীতে নেহরু বলেছেন— তিনি এবং তাঁর দুই কংগ্রেসি সহকর্মী সঙ্গীর বিরুদ্ধে নাভা-র আদালতে একতরফা বিচার চলাকালে জেলসুপার তাঁদের জানিয়েছিলেন যে, তারা যদি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁরা নাভা থেকে চলে যাবেন তাহলে প্রশাসক তাঁদের বিরুদ্ধে

ফঃ ৩

দায়ের করা মামলা তুলে নেবেন। জওহরলালদের জবাব ছিল, দুঃখ প্রকাশ করার কথাই ওঠে না; বরং প্রশাসনেরই উচিত তাঁদের কাছে ক্ষমা চাওয়া। এবং তাঁরা কোনো প্রতিশ্রুতি দেবেন না। ('That there was nothing to express regret about, So far as we were concerned; it was for the administration to apologise to us. we were also not prepared to give any undertaking.'

কারাদণ্ড ও কারামুক্তি প্রসঙ্গে জওহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, দেশীয় রাজ্য নাভার আদালতের বিচারক তাঁর রায় তাঁদের পড়ে শোনাননি, কেরল কারাদণ্ডের সিদ্ধান্তের কথা তাঁদের বলা হয়েছিল। কারাগার থেকে জওহরলালরা রায়ের কপি চেয়ে পাঠালে তাঁদের বলা হয়েছিল, যথাবিধি দরখাস্ত করতে। আর সেইদিনই অপরাহ্ন জেল-সুপার তাঁর অফিসে তাঁদের ডেকে পাঠিয়ে প্রশাসকের সহি করা ছুটি আদেশপত্র তাঁদের দেখিয়েছিলেন। একটা ছিল, ক্রিমিন্যাল প্রোসিডিয়ার মোতাবেক ('under the Criminal Procedure Code') তাঁদের ওপর দণ্ডাদেশের নিঃশর্ত স্থগিতাদেশ; অপরটিতে প্রশাসনিক নির্দেশ ('Executive Order') ছিল— নাভা থেকে তাঁদের চলে যেতে হবে এবং বিশেষ অনুমতি ব্যতীত তাঁরা নাভা রাজ্যে ফিরে আসতে পারবে না ('and not to return to the State without special permission.')। জওহরলাল আদেশপত্র দুটির কপি চেয়েছিলেন, তাঁকে তা দেওয়া হয়নি। তারপর পুলিশ প্রহরায় জওহরলাল এবং তাঁর দুই সঙ্গীকে রেল স্টেশনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। নাভাতে জওহরলালদের কারও সঙ্গে চেনা-পরিচয় ছিল না; নগরের ফটকও রাতের মতো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ রেল স্টেশনে বসে থাকার পর আম্বালা-গামী একটি ট্রেন ছাড়ছে দেখে জওহরলাল তাঁর দুই সঙ্গীকে নিয়ে সেই ট্রেনে আম্বালা পৌঁছেছিলেন। বলা বাহুল্য, সন্দীপবাবু পরের মুখে (অধ্যাপক চমনলাল?) ঝাল খেয়েছেন, তিনি নিজে জওহরলালের 'An Autography' পড়ার অবকাশ পাননি। তা নাহলে, তিনি বলতেন না, জওহরলাল একবার মুচলেকা দিয়ে ব্রিটিশ জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন এবং অভিযোগ করতেন না যে তিনি তাঁর দুই সহগামী সঙ্গীকে ফেলে রেখে নাভা থেকে চলে এসেছিলেন।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা।

প্রতিবেদকের বক্তব্য

নেহরুর জীবনের এই ঘটনাটি সম্বন্ধে বর্তমান প্রতিবেদকের কোনও ধারণাই ছিল না। মুখ্যত দুই সংবাদমাধ্যম First Post এবং Times Now পোর্টালে প্রকাশিত দুটি প্রতিবেদনের মারফত প্রথম চোখে পড়ে। স্বস্তিকায় প্রকাশিত লেখাটি এই দুই প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং অন্যের লেখায় প্রকাশিত তথ্য বিশ্বাস করে নিজের লেখা তৈরি করলে তা ত্রুটি হিসেবে গণ্য হতেই পারে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য এই প্রতিবেদক আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। পত্রলেখককে তাঁর ন্যায়সংগত সমালোচনার জন্য ধন্যবাদ।

বিচার এবং জাস্টিস অভিজিৎ গাঙ্গুলি এখন সমার্থক শব্দ

আগে বাজারে গেলে ঝালাপালা হয়ে যেত— কোর্ট মানে শুধু ঘুষ। কিছু বলতে গেলে তার আগে বলত কোর্টের ইট-কাঠ, কড়িকাঠও নাকি ঘুষ খায়। আমরা যারা কোর্ট কাছারিতে কাজ করি শুনতে শুনতে গা সওয়া হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম এমন কথা শুনতে খুব অপ্রস্তুত লাগত। মনে হতো কী পাপ করে না হাইকোর্টে চাকরি করছি। পরে বুঝেছি কোর্টে কাজ করলে শুনতে হয়। এখন আর কিছু মনে করি না। জানি তারা কেউ সুখে বলছে না, ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশায় বলছেন। ভুক্তভোগীদের কত জ্বালা! কোর্ট আর ল' ইয়ারদের পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে ধনদৌলত, যৌবন, জীবন নিঃশেষ হয়ে যায়, তবুও কখনো মামলা নিষ্পত্তি হয় না। কোর্ট হয়রানি আর রগড়ানির ভালো জায়গা বলে সকলে জানেন। কে সে ভাগ্যবান গোলকধাঁধার মতো আইনের দীর্ঘ মারপ্যাঁচ থেকে মুক্তি পায়! কার সাধ্যি মাতলা নদীর মতো ঘোলাটে বিচার থেকে মুক্তি খোঁজে!

উইলিয়াম শেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকে 'A Daniel has come'-এর মতো হঠাৎ ঈশ্বর প্রেরিত বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি আবির্ভাব হয়। চিরাচরিত দীর্ঘসূত্রতা, ক্ষয়িষ্ণু বিচার প্রক্রিয়া তিনি আমূল পালটে দেন। জনগণ তাদের দ্রুত ন্যায় বিচার পান। এমন দীর্ঘসূত্রতা বিচার ব্যবস্থায় জনগণ দ্রুত বিচার পেয়ে দারুণ উল্লসিত হন। জনগণ মনে করেন এখন বিচার আছে কারণ হাইকোর্টে বিচারপতির এজলাসে বসে আছেন বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি। রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে ট্রেনে সর্বত্রই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু কেবল একটা নাম জাস্টিস গাঙ্গুলি।

চাকরি প্রার্থীদের থেকে শুরু করে পাবলিক লিটিগেট সবাই বিচার পাচ্ছেন। স্কুল শিক্ষক চাকরি প্রার্থীরা তাঁকে ঈশ্বর প্রেরিত দেবদূত বলে মনে করেন। বিচার সম্বন্ধে জনগণের ধ্যানধারণা তিনি আমূল পালটে দিয়েছেন। বাজারে গেলে আগের মতো এখন আর গালাগাল খেতে হয় না। এখন বেশ কদর করে। তারা বিচারপতি গাঙ্গুলি সম্বন্ধে জানতে কৌতূহলী হয়। সেদিন সকালে চা খেতে গিয়ে দেখি পাড়ার চা দোকানি ধনঞ্জয় দেওয়ালে টাঙানো জাস্টিস অভিজিৎ গাঙ্গুলির ছবিতে ধূপ ধূনো দিয়ে প্রণাম করছে। প্রণাম সেরে সে বলে 'এই আমার ভগবান।' চা পান করতে করতে ভাবছি 'মহাপুরুষদের ছবি ছাড়া কখনো চোখে দেখিনি, সত্যি আজ কিংবদন্তি মহাপুরুষকে দেখছি।' প্রাতঃস্মরণীয়কে সেদিন প্রাতে দেখে ধনঞ্জয়ের মতো আমারও মন ভক্তি শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে ওঠে। আমরা যারা কোর্ট কাছারিতে কাজ করি এমন সুখবরে আনন্দ পাই। ফুলের গন্ধের মতো মৌ মৌ করে ছড়িয়ে পড়ে। এমন সুখবর জনগণের সঙ্গে আমাদের সুখ দেয় বইকী।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

বাড়িতে বাড়িতে সর্বজনীন পুস্তকালয় তত্ত্বাবধানে মহিলারা

সুতপা বসাক ভড়

সহ্যাদ্রি পর্বতের কোণে অবস্থিত ভিলার গ্রাম। সেখানে ৩৫টি পরিবার ৩৫ হাজারেরও বেশি সংখ্যক বই সংগ্রহ করে নিজ নিজ বাসভবনে সর্বজনীন পুস্তকালয় স্থাপন করেছেন। এর শুভ সূচনা হয় কয়েক বছর আগে শশীকান্ত ভিলারের মেয়ের বিয়েতে। শশীকান্ত তাঁর মেয়ের বিয়েতে আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রত্যেককে তাঁর প্রিয় দুটি পুস্তক উপহার দেন। এরপর তিনি গ্রামে পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন। তাঁর বাড়ির ওপরের তলায় গ্রামের পুস্তকালয়গুলির কার্যালয় স্থাপন করেছেন। এরপর থেকে তিনি পুস্তক সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজ-খবর রেখেছেন এবং চেষ্টা করেছেন যাতে প্রতি মাসেই একগুচ্ছ নতুন পুস্তক গ্রামে পৌঁছে যায়।

ভিলার গ্রামে বর্তমানে এখানে ৩৫ হাজারের বেশি নানান বিষয়ের পুস্তক সমন্বিত ৩৫টির বেশি পুস্তকালয় আছে। এখানে মহাবালেশ্বরের পাহাড়ে রাজ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃষ্টিপাত হয়। ভ্যাপসা আবহাওয়া ও আর্দ্রতার জন্য প্রথমদিকে বেশ কিছু পুস্তক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে সরকারের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের শেখানো হয় কীভাবে বইয়ের যত্ন নিতে হবে, কীভাবে পাঠকদেরও বইয়ের যত্ন নেওয়া শেখাতে হবে। এছাড়া সরকারের একজন প্রতিনিধি প্রতি দু'মাস অন্তর বইগুলির দেখাশোনা করতে আসেন। বর্তমানে বাড়ির মহিলারা বই বাঁধানো ও সেগুলিকে ভালোভাবে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করছেন।

কেউ পুস্তকালয়ের বাড়ির খোঁজখবর নিলে পুলকিত হয়ে ওঠেন গ্রামবাসী। আগ্রহের সঙ্গে দেখিয়ে দেন পথ। গণপত পার্থের বাড়িতে একদিন সকালে দেখা গেল বাড়ির মহিলারা ঘরের কাজ করছেন, এরই মধ্যে বাড়ির ছোট্ট মেয়েটি পুস্তকালয়ের দরজা খুলে দেয় এবং জানায় যে পাঠকেরা যেন নিশ্চিন্তে বসে পড়াশোনা করেন। বাড়ির সবথেকে বয়স্কা মহিলা জানান যে, অতিথি এলেও তাঁরা তাঁদের দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে থাকেন। পরিবারের যে কোনো একজন সদস্য তাঁদের বইয়ের আলমারি দেখিয়ে দেন। এরপর তাঁরা সোফা, বারান্দা যেখানে খুশি যতক্ষণ খুশি বসে বই পড়তে পারেন। এতে মহিলাদের কোনোরকম অসুবিধা হয় না। সময় সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত। তবে বই নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই, পুস্তকালয়ে বসেই বই পড়ার নিয়ম। এই পুস্তকালয়ের ফলে গ্রামে উপার্জনেরও পথ খুলে গেছে। যারা বই পড়তে আসেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আরামদায়ক হোম-স্টে এবং বাড়িতে বানানো খাবার পছন্দ করছেন। মহাবালেশ্বর পঞ্চগানির হোটেল-রিসর্টের থেকে এখানে থাকা অনেক বেশি সাশ্রয়কর আরামদায়ক।

শিল্পা সাওন্তের একতলা বাড়িতে ৮৫০টি কমিক বই আছে। শিল্পা নিজে একজন গৃহবধূ এবং একনিষ্ঠ পাঠিকা। তিনি জানিয়েছেন যে, পুস্তক-গ্রামের ধারণার পর থেকে সবকিছু যেন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। তাঁর বাড়ির দালানে যে পুস্তকালয়টি আছে, সেটি ওই গ্রামে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং সর্বাধিক সংখ্যায় পাঠক-পাঠিকারা এখানে আসেন। শিল্পা জানিয়েছেন, তাঁর পুস্তকালয়ে দিলীপ প্রভাওয়ালকারের মতো বিখ্যাত অভিনেতা (যিনি 'লাগে রহো মুন্নাভাই'-তে গান্ধীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন) এসেছেন। আর একজন মহিলা, মঙ্গলা ভিলারের বাড়িতে টালির ছাদ ও কাঠের মেঝে, বারান্দায় গল্প-উপন্যাসের বই, ওঠোনে বেলফুলের গাছ, ছাতের ওপর বোগেনভেলিয়া— সব মিলিয়ে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। মঙ্গলা জানিয়েছেন, তাঁরা বাড়িতে তালা লাগান না।

ভিলার গ্রামে, পুস্তকালয়ের কার্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধিত একটি মানচিত্র দেওয়া হয়। সেইমতো পাঠকরা তাঁদের পছন্দমতো পুস্তকালয়ের দিকে এগিয়ে চলেন। সরকার থেকে জানানো হয়েছে যে গ্রামবাসীরা, বিশেষ করে বাড়ির মহিলারা এই প্রকল্পটির প্রণেতা। সরকারের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন, অনেকসময় একটি সম্পূর্ণ পরিবার আসে, সেক্ষেত্রে বাচ্চাদের কথা বিবেচনা করে শিশু কিশোর সাহিত্যও রাখা হয়। মূলত মারাঠি ভাষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষার বইও আছে। দুটি পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানের জন্য মুম্বাই, পুণে ও গুজরাট থেকে অনেক পর্যটক এখানে আসেন। ভিলার গ্রামের পুস্তকালয় থেকে উৎসাহিত হয়ে মহারাষ্ট্র সরকার গ্রামে-গ্রামে এইরকম সর্বজনীন পুস্তকালয় স্থাপন করার বিষয়ে চিন্তা করছে।

ভিলার গ্রামের এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে ওই গ্রামের মহিলারা। মঙ্গলা, শিল্পার মতো সাধারণ গৃহবধূরা গৃহকাজের সঙ্গে সঙ্গে একটি মহান উদ্দেশ্যে ব্রতী হয়েছেন, পাঠককুলের পুস্তকের প্রতি তৃষ্ণা নিবারণের সঙ্গে তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রেখেছেন। ফলে মা-সরস্বতীর সঙ্গে মা-লক্ষ্মীর কৃপাধন্য হয়েছেন তাঁরা।

কোমর-পিঠে যন্ত্রণায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

পিঠের চোট-আঘাত থেকে শুরু করে আমাদের মেরুদণ্ডের বিভিন্ন রকম রোগ—আর্থ্রাইটিস, স্পন্ডিলাইটিস এমনকী ইনফেকশন অথবা ক্যানসার থেকেও পিঠে ব্যথা ও যন্ত্রণা হতে পারে।

- সুষম খাবার খেতে হবে।
- রোজ ব্যায়াম (যেগুলো পিঠের পেশি শক্তি বাড়ায়) করতে হবে।
- ভারী ওজন তোলার সময় সাবধান হয়ে পিঠের চোট-আঘাত এড়াতে হবে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যথার ওষুধে যন্ত্রণা কমে যায়। কিন্তু যদি ওই ব্যথার সঙ্গে হাতে-পায়ে ঝিনঝিনে ভাব আসে অথবা ইউরিন ধরে রাখতে অসুবিধে হয়, কিংবা জ্বর আসতে থাকে তাহলে আপনাকে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে হবে। প্রথমে বাড়ির বা পাড়ার ডাক্তারবাবুকে দেখাবেন। কষ্ট না কমলে স্পেশালিস্টকে (ইন্টারভেনশনাল পেইন ফিজিসিয়ান) দেখাতে হবে। রোগীর কাছ থেকে রোগের ইতিহাস এবং রোগীকে শারীরিক পরীক্ষা করার পর প্রয়োজনমতো রক্ত পরীক্ষা, সি টি স্ক্যান, এম আর আই, ই এম জি, এন সি ভি ইত্যাদি টেস্ট করা হয়।

অ্যাকিউট ব্যাক পেইন-এর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ব্যথার ওষুধ এবং বিশ্রামের প্রয়োজন। এ সময়ে ব্যায়াম করার প্রয়োজন নেই।

ক্রনিক ব্যাক পেইন থাকলে অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে কোমর বা পিঠের যন্ত্রণায় ভুগলে চিকিৎসা করার পদ্ধতি অনেক বেশি জটিল। প্রথাগত যে পদ্ধতি চলে আসছে তার মধ্যে ব্যথার মালিশ, বিভিন্ন রকম ব্যথার ওষুধ থেকে শুরু করে ট্র্যাকশন দেওয়া অথবা কর্সেট বা ব্রেস-এর কোনও বিজ্ঞানসম্মত স্বীকৃতি নেই যে এটা দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে ব্যবহারও রয়েছে। প্রথমত, চিকিৎসার অসুবিধা হলো : (১) ব্যথার ওষুধ বেশিদিন

খেলে শারীরিক ক্ষতি হয়, (২) ট্র্যাকশনের কোনও বিজ্ঞানসম্মত স্বীকৃতি নেই যে এটা দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে রোগীর উপকার করে, (৩) করসেট বা ব্রেস সাধারণত অপারেশনের পর কাজে লাগলেও পেশির ব্যবহারকে সীমিত করে দেয়। ফলে পরবর্তীকালে সমস্যা বাড়ে। এই সমস্ত প্রথাগত চিকিৎসা বিফলে গেলে বিশেষজ্ঞের অর্থাৎ ইন্টারভেনশনাল পেইন ফিজিশিয়ানের মতামত নিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি কোঅ্যাগুলেশন : চারপাশের স্বাভাবিক নার্ভগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেই যন্ত্রণার জন্য দায়ী নার্ভটিকে উচ্চশক্তি সম্পন্ন তাপপ্রবাহের মাধ্যমে নষ্ট করা হয়।

ট্রিগার পয়েন্ট ইঞ্জেকশন : কোনও একটি পয়েন্টে যন্ত্রণা থাকলে লোকাল অ্যানাস্থেশিয়া ইঞ্জেকশন দিয়ে তা নিরাময় করা হয়। এতদিন এই ধরনের রোগের চিকিৎসা করতেন নিউরো সার্জেনরাই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে পেইন ফিজিশিয়ানদের ছোটো ছোটো পদ্ধতি ব্যবহার করে এড়ানো যাচ্ছে বড়ো নিউরো সার্জারি। পদ্ধতিগুলির ছোটো করে বর্ণনা দেওয়া যাক।

ওজোন ডিসেকটমি : প্রোলাপ্সড ডিস্ক বা স্লিপড ডিস্ক-এ ওজোন।

যেখানে সার্জারির প্রয়োজন : সার্জারি প্রয়োজন হবে কি না তা অনেকটা নির্ভর করবে ডায়াগনোসিসের ওপর। অনেক সময় এই সমস্ত চিকিৎসায় ফল না পেলে সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে। সার্জারির পদ্ধতিগুলির মধ্যে আসে মাইক্রোডিসেকটমি (মাইক্রোস্কোপে দেখে ডিস্ক বার করে নেওয়া হয়), লেসারের মাধ্যমে ডিস্কটিকে নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং স্পাইনাল ফিউসন করে অর্থাৎ বোন গ্র্যাফটিং দিয়ে ডিস্কের স্লিপ, অর্থাৎ বেরিয়ে আসা বন্ধ করা যায়। মনে রাখতে হবে যে এই সমস্ত সার্জারি কিন্তু প্রথাগত নিউরো সার্জারির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই সমস্ত পদ্ধতি প্রয়োগের পর রোগীকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়।

কোমর বা পিঠের যন্ত্রণা থেকে দূরে রাখার পরামর্শ :

- জোরে হাঁটুন, সাঁতার কাটুন বা সাইকেল চালান আর ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করুন। বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে কোমরের পেশিকে শক্ত করার ব্যায়াম জেনে নিন।
- নিয়মিত যোগ ব্যায়াম করুন।
- আপনার অফিসের টেবিল চেয়ারের উচ্চতা যেমন আপনার কমফর্টেবল হয়।
- যে চেয়ারে বসে কাজ করেন তা যেন আপনার কোমরকে ভালো সার্পোট দেয়। দরকার হলে কোমরের পিছনে ছোটো বালিশ রাখুন। একভাবে দীর্ঘক্ষণ না বসে থেকে, একটু হাঁটুন বা স্ট্রেচ করুন।
- ছোটো হিলের জুতো পরুন।
- নরম বিছানায় শোবেন না।
- খুব বেশি ভারী ওজন তুলবেন না। বিশেষত সমানে কোমর ঝুঁকিয়ে কিছুই তুলবেন না। দরকার হলে হাঁটু ভাঁজ করে নীচের জিনিস তুলবেন।
- সুষম খাবার খাওয়া খুব জরুরি—যাতে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন ডি থাকে।
- ধূমপান একেবারে বন্ধ করে দিন।

এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসু।

ওর, ওর এবং ওরও, সবার আবদুল্লারা অন্তরে ও চরিত্রে অভিন্ন

তাই বুঝতে হবে সব আবদুল্লাই আদতে জেহাদি

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

প্রেমে আবার কীসের ধর্ম? কীসের আমরা-ওরা? সবাই সহমত নিশ্চয়ই। কিন্তু মুসলমান ছেলের প্রেমে যদি হিন্দু মেয়েটির প্রতি ব্যবহারিক প্রতারণা থাকে, অন্তরে থাকে ধর্মীয় উগ্রবাদ, যদি মহিলা সঙ্গিনীকে সে কেবলমাত্র যোনি-জরায়ুর যন্ত্রই মনে করে, প্রেম হয়ে ওঠে ধর্মান্তরকরণের বোর্ডিং পাশ তখন তো তাকে ভালোবাসা বলা যায় না। যা ছদ্মবেশী মেকি, ভণিতাসর্বস্ব সম্পর্কে হিন্দু মেয়েদের প্রেমজালে বশীভূত করে এবং তারপরই শুরু হয় মোল্লাবাদী ফতোয়া। হিন্দু মেয়েটির ধর্মীয় ভাবাবেগ, ব্যক্তিত্ব ও অভ্যাসের ওপর চলে অনবরত ইসলামি সন্ত্রাস— তা কোনো সম্পর্ক নয়, তা আসলে সন্ত্রাস জাল। যে সন্ত্রাসজালে প্রতিদিন অসংখ্য হিন্দু মেয়ের জীবন, স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ছারখার হয়ে যাচ্ছে। সেকুলারিজমের ধ্বজাধারীরা ভুল করেও এই জ্বলন্ত সমস্যার কারণ এবং তার সমাধানের আলোচনার পথে হাঁটেন না। হিন্দু মেয়েকে বিবাহ কিংবা সহবাসের পরক্ষণেই মুসলমান ছেলেটি যখন বলপূর্বক তাকে গোমাংস খেতে বাধ্য করে, অমত হলেই প্রেমের দক্ষিণাস্বরূপ জোটে শারীরিক মানসিক নিগ্রহ— কই এসব সমস্যায় তো সেকুলারিজম সরব হয় না। একদল বলে উঠবে এসব কথা সেকেলে, বস্তাপচা। বাস্তব এটাই, সেকেলে মুসলমান পুরুষটি যখন হিন্দু মেয়ের সঙ্গে প্রণয় পর্বে এসেছে তা অনেকাংশেই খাঁটি ছিল। আজকের মতো লাভ জিহাদ অর্থাৎ প্রেমের অভিনয় এবং ধর্মান্তরিত করা, তারপরেই অনৈতিক অত্যাচার ও গ্লানির যন্ত্রণায় হিন্দু মেয়েটিকে ঠেলে দেওয়া ঠিক ছিল না। এও আর এক ধর্মান্ধতা। ইসলামি অত্যাচারে বারে বারে হিন্দু মহিলাদের লুণ্ঠন করা হয়েছে। সে কলঙ্কের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। কিন্তু আজকে এ এক নতুন প্রক্রিয়া তরতরিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যেখানে রয়েছে প্রেমের ফাঁদ এবং তারপর ধর্মান্ধতা ও অত্যাচার।

মিঠু রায় ওরফে আব্দুল শাহজাহান

১৯৩২-এর ১ অক্টোবর, 'দৈনিক বসুমতী'তে 'মুসলমানের সহিত হিন্দুর বিবাহে মহিলাদের আপত্তি' শিরোনামে একটা চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। না সেদিন কোনো মোল্লাবাদী আগ্রাসনের কথা ওঠেনি। সামাজিক ওঠাপড়া এবং গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে নানা মুনির নানা মত ছিল। বিশ শতকে এই বাঙ্গলার বুকেই রোম্যান্টিক জুটি ছিলেন শান্তি দাস ও হুমায়ুন কবির। ১৯২৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তাদের প্রথম পরিচয়, প্রণয়। একে অন্যের প্রতি ছিল অসীম শ্রদ্ধা। ১৯৩২-এ টাউনহলে মহিলা কংগ্রেসের অধিবেশন বসলে শান্তি দেবী ভিন্ন ধর্মী নারী পুরুষের বিবাহ অধিকার বিষয়ে তৎপর হন। তাঁকে সমর্থন করেন আরও এক বিদুষী কন্যা জ্যোৎস্না মিত্র। সেদিন ওঁরা সত্যিই প্রগতিশীল ছিলেন। অনেক আপত্তি ও বিদ্রূপ সেদিন সমাজে। সবকিছু উপেক্ষা করে ১৯৩২-এ বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে শান্তি ও হুমায়ুনের পরিণয় সম্পন্ন হলো। হুমায়ুন এসেছিলেন খদ্দরের ধুতি মালা চন্দনে। শান্তি দেবী কিন্তু ধর্ম ও জীবনচর্যা পরিবর্তন করেননি। এই বিবাহ নিয়েই বসুমতীতে ঢি ঢি, রে রে পড়ে যায়। শান্তি দেবীর মা অশোকলতা বঙ্গবাণী পত্রিকায় সেদিন এক চাবুক-চিঠি লিখে জানান— সমস্ত মানবজাতি অখণ্ড পরিবার। সেকেলে এক ভিন ধর্মী প্রেমের গল্প কিন্তু চিন্তায়, দর্শনে, অভ্যাসে তা ছিল প্রগতিশীল।

১৯২০-তে আর্য সমাজ একদিন শুদ্ধি আন্দোলন করেছিল, ধর্মান্তরিত হিন্দুদের ফিরিয়ে আনতে। এক শতাব্দী পার করে আজকে সে প্রক্রিয়া অবলম্বন না করি, কিন্তু উদ্দেশ্য একই রয়ে গেছে— মোল্লাবাদী আগ্রাসন থেকে হিন্দু সম্ভ্রম রক্ষা করা।

আজ আমরা স্মার্ট ফোনের যুগে কিন্তু সংবাদ শিরোনামে দেখছি গৌহাটির 'মিন্টু রায়'-এর ঘটনা। যে মিন্টু আসলে আব্দুল শাহজাহান। প্রেম করল মিন্টু নাম নিয়ে। হিন্দু মেয়েটিকে কামাখ্যা মন্দিরে বিয়েও করল। তারপরেই স্বমূর্তিতে 'মিন্টু' হাজির। নিদারুণ অত্যাচার চলে হিন্দু মেয়েটির ওপর গোমাংস খাওয়ানোর জন্য। মিন্টুর ঘটনা সম্পূর্ণ লাভ জিহাদ। আবার এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটছে যেখানে হিন্দু মেয়েটির মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মায় যে, তার প্রেমিক এক ব্যতিক্রমী মুসলমান। সে প্রগতিশীল মননের এবং ধর্মান্ধ নয়। বিশ্বাসগুলো তাসের ঘরের মতো ভেঙে যাচ্ছে। 'মেরা আবদুল্লা অলগ হ্যায়' বলা হিন্দু মেয়েগুলো ভাষাহীন ক্লীবতায় আবিষ্কার করছে— ওর, ওর এবং ওরও, সবার আবদুল্লারা অন্তরে ও চরিত্রে অভিন্ন। সবাই জেহাদি, হিন্দু বিদ্বেষী, মোল্লাবাদী, ধর্মান্ধ এবং প্রেম বা সহবাস বা বিবাহ আসলে ধর্মান্তরকরণের লোভনীয় চক্র। বলা ভালো হিন্দু মেয়েটির চক্রব্যূহ।

ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিম, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী সর্বত্র ঘটছে 'মেরা আবদুল্লা অলগ হ্যায়'-এর মতো মরীচিকা। এ বছর মে মাসে তামিলনাড়ুর যে ঘটনা প্রকাশ্যে এল তা যেন কোনো স্থিতিশীল সমাজের আবর্জনা। ২১ বছরের হিন্দু মেয়ে ইমান হামিবের প্রেম জালে আটকে গেল। তারা সহবাসও করল। দু' মাস কাটতে পারল না, মেয়েটিকে ধর্মান্তরিত হতে হবে যে! ওটাতেই তো মোক্ষ লাভ হবে ইমানের। চলতে থাকে মানসিক শারীরিক নিগ্রহ, অবিরাম নির্যাতন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই মেয়েটি সম্পর্কে ছেদ আনতে চায়। সে রাস্তাও বন্ধ, তাদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিয়ো আছে ইমানের হাতে। ২০২১-এর দীপাবলির পর পর ইমান ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিয়ো উন্মুক্ত করে দেয় ইনস্টাগ্রামে। প্রতিটা অতি আকর্ষণীয় প্রেম বার্তা যেন এক একটা হিন্দু মেয়ের জীবনে কালকের দীর্ঘশ্বাস হতে চলেছে। মোল্লাবাদী ছেলেটি ঠিক যেন চার্লস শোভরাজ, হিন্দু মেয়েটি তখন সব নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে। এ এক এমন সম্মোহনী জাল যেখানে কোনো যুক্তি খাটে না। সব 'আবদুল্লা' এক একটা হিন্দু মেয়ের চোখে তার পরিবার আত্মীয়ের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যে কোনো ভ্রমই সুন্দর হয় কিনা!

সেই ভ্রমের পরিণামেই ঘটে কর্ণাটকের

সমস্যা লিপিবদ্ধ করার দিন শেষ এবার শুরু হোক উপলব্ধি এবং সম্ভ্রম রক্ষার কৌশল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন— 'বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত আছে।' একটু বদলে বলতেই হচ্ছে— 'আবদুল্লা প্রণয়ে অভিসম্পাত আছে।'

অপূর্ব পুরানিকের মতো নৃশংস ঘটনা। অপূর্ব এমবিএ পঠনপাঠনকালে ইজাজের প্রণয় জালে ধরা পড়ে। ২০১৮-তে বিবাহও হয়। অপূর্বর নাম বদলে হয়ে গেল আরফা বানু। ২০২১-এর অন্তিমে এসে ইসলামে ধর্মান্তরিত মেয়েটি জানতে পারল, তার স্বামীর অন্যত্র অন্য স্ত্রী রয়েছে। এর চাইতে বড়ো লাঞ্ছনা প্রতারণা আর কীই-বা হতে পারে। সে যখন বিবাহ বিচ্ছেদ চায়, তখন উত্তরে মেলে শানিত অস্ত্রের ২৩ খানা কোপ। এমন কত শত ঘটনা গ্রামে প্রান্তিক অঞ্চলে ঘটে চলেছে, যার খোঁজ নেওয়া হয় না। হিসেব রাখাও যায় না। কিন্তু শুধু কেন প্রান্তিক হিন্দু মেয়েটিই বলি হচ্ছে? ২০১৮-র দেশজোড়া সংবাদ কি ভুলে গেলাম আমরা? আমলা (আইএএস) টিনা দেবী ও আতহার আমিরের নাম জাতীয় সংবাদের শিরোনাম হয়ে গেল সেদিন। একজন মহিলা আইএএস আধিকারিক তাকেও একই ধর্মান্ধতার কবলে পড়তে হলো। টিনা দেবীকে তাঁর মুসলমান স্বামী নিত্যদিন অত্যাচার করে গেছে বোরখা পরার জন্য। বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করতে চেয়েছে। টিনাদেবীর নামে 'খান' জুড়তে সচেষ্ট হয় মোল্লাবাদী স্বামী। তাই 'মেরা আবদুল্লা অলগ হ্যায়' যে কেবল আবেগের বশে, কিছু মিষ্টি কথা, ব্যবহার উপহারে কাঁচা মাথার হিন্দু মেয়েটিই বলছে তা নয়। টিনাদেবীর মতো পরিণত শিক্ষিতা প্রতিষ্ঠিতা কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাকেও একই পরিণতি ভোগ করতে হচ্ছে। এই আবদুল্লাদের উগ্রবাদের জাল সর্বত্র বিস্তার হচ্ছে।

হিন্দু মেয়েরা যদি সতর্ক না হয়, তারা যদি নিজেদের জীবন ও জীবনচর্যা বিষয়ে দিক দর্শন না করেন তবে এই প্রেমের আড়ালে মোল্লাবাদের প্রসার চলতেই থাকবে। স্বাভাবিক ভাবেই মনে হতে পারে, এক হিন্দু মেয়ের কাছে এর চেয়ে আর কীই-বা আশা করা যায়। তাহলে ভ্যালিডেট করতে এ বছরের আগস্টে মুসলমান যুবক মহম্মদ শামিম হায়দারের বক্তব্য তুলে ধরতেই হয়। যিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় সক্রিয় উদ্যোগে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেন, বলেছেন— হিন্দু মেয়েরা যেন মুসলমান ছেলেদের বিবাহ না করে। উদাহরণস্বরূপ তিনি মুসলমান থাকাকালীন তার নিজের স্ত্রীকেই টেনে আনেন। দীর্ঘ ১৪ বছর কেটে গেল সংসারে স্বীকৃতি সম্মান অধিকার কিছুই যে তার স্ত্রী পেলেন না। তিনি কন্যা সন্তানের মা, তাই আরও অনাদর। মহম্মদ সালিম তাই সেই ধর্ম ত্যাগ করলেন যে ধর্ম তার স্ত্রী ও কন্যাকে মান, আদর, উপযুক্ত অধিকার দিতে পারে না। অন্য ধর্মের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করার অধিকার আমাদের অবশ্যই নেই এবং হিন্দুরা অতি সহনশীল। তাই হিন্দু মেয়েদের বলি হতে হচ্ছে মোল্লাবাদের কাছে। যেখানে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, প্রণয়— এসবের ঊর্ধ্বেও বড়ো জিজ্ঞাসা এই সম্পর্ক কি আদৌ একটা সুস্থ জীবন দিতে পারছে? সম্পর্কের জাল তৈরি করে ইসলমি ক্ষমতা কায়েম করার নাম 'লাভ জিহাদ'। এই পথে মরীচিকার ঘোরে যে সব হিন্দু মেয়ে সরল মনে আসছে তাদের মনে তাদের আবদুল্লারা সুপারহিরো।

এ দেশের প্রতিটা হিন্দু মেয়েকে সজাগ সচেতন হতে হবে। ২০২০-তে নিকিতা তোমরের ঘটনার পরেও তো 'আবদুল্লা'দের জাল বিস্তার থামল না। নিকিতা ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। দিবালোকে জেহাদিরা তাকে হত্যা করে ওই বছরের অক্টোবরে। ইসলামি আক্রমণকারীরা সেই কোন যুগ বিন কাশিম থেকে থেকে তৈমুর লং, নাদির শাহ থেকে আবদালি— সবাই অখণ্ড ভারতের সম্পদ এবং নারীর সম্ভ্রম লুঠ করেছে। আজ যাকে লাভ জিহাদ বলছি, তা হাজার বছরের পুরনো

ইসলামি রাজনৈতিক আগ্রাসনের অংশ। আমির খাসরু উজবেকিস্তানের মুসলমান পিতার সন্তান। কিন্তু উল্লেখ হয় না তাঁর মা ছিলেন রাজপুত কন্যা। কিছু বছর আগে ভাদোদরার দৈনিকে উল্লেখ করেছে হিন্দু মেয়েদের প্রেমের ফাঁদে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশে মোটর সাইকেলে হাওয়া খাওয়া-সহ রোমিয়োদের পকেটমানিও আসে মসজিদ থেকে। তাই প্রেমের মতো পবিত্র বিষয়ে যখন মোল্লাবাদী আগ্রাসন ব্যাপক তখন আবদুল্লা এলেই হিন্দু মেয়েদের সতর্ক হতে হবে। ওয়াকিবহাল থাকতে হবে এবং অভিভাবকের সুচিন্তিত পরামর্শ একান্ত প্রয়োজনীয়।

এ সমস্যা সারা বিশ্বের জটিল রোগ। সদ্য পাকিস্তানের হিন্দু পঞ্চায়েত দাবি করছে সিন্ধু প্রদেশের অধিকাংশ হিন্দু মেয়েকে ফুসলে ফাসলে প্রেমজালে আবদ্ধ করে এবং ধর্মান্ধকরণ প্রক্রিয়া নিত্যদিনের ঘটনা। কখনও কখনও বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হচ্ছে হিন্দু মেয়েরা। ভারতের আইনে সুরক্ষা সুস্থিত। তাই সিন্ধু প্রদেশের মতো দিবালোকে যথেচ্ছ আচরণ হয়তো-বা সবসময় সম্ভব নয়। তাই রোমিয়ো আবদুল্লা প্রথমে প্রাণনাথ হয়ে ওঠে এবং একটু ধীরগতিতে প্রেমজালে ধর্মান্তরিত প্রক্রিয়ার প্যাঁচ দেয়। ১৯২০-তে আর্য সমাজ একদিন শুদ্ধি আন্দোলন করেছিল, ধর্মান্তরিত হিন্দুদের ফিরিয়ে আনতে। এক শতাব্দী পার করে আজকে সে প্রক্রিয়া অবলম্বন না করি, কিন্তু উদ্দেশ্য একই রয়ে গেছে— মোল্লাবাদী আগ্রাসন থেকে হিন্দু সম্ভ্রম রক্ষা করা। হিন্দুদের আমাদের 'ধর্ম' বলার সঙ্গে সঙ্গে এও বলতে হবে আমাদের 'তনয়া'— তবেই না আবদুল্লাদের আগ্রাসন থামবে। ১৯২৫-এ মুসলমান আগ্রাসন থেকে হিন্দু মেয়েদের রক্ষার্থে তৈরি হয়েছিল হিন্দু সভা। স্বেচ্ছাসেবীরা সদা সতর্ক থাকতেন যেন বাড়ির মেয়েদের ইসলামি ফাঁদে পা কাটতে না হয়। আজ এতো আইন, প্রযুক্তি, আধুনিক আমরা কিন্তু মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার নেশা কাটেনি আবদুল্লাদের। আমরা কোনো ধর্মের প্রতি নালিশ জানাচ্ছি না। আমরা মোল্লাবাদী ধর্মান্ধতা এবং অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে সতর্ক হচ্ছি। সমস্যা লিপিবদ্ধ করার দিন শেষ এবার শুরু হোক উপলব্ধি এবং সম্ভ্রম রক্ষার কৌশল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন--- 'বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত আছে।' একটু বদলে বলতেই হচ্ছে— 'আবদুল্লা প্রণয়ে অভিসম্পাত আছে।'

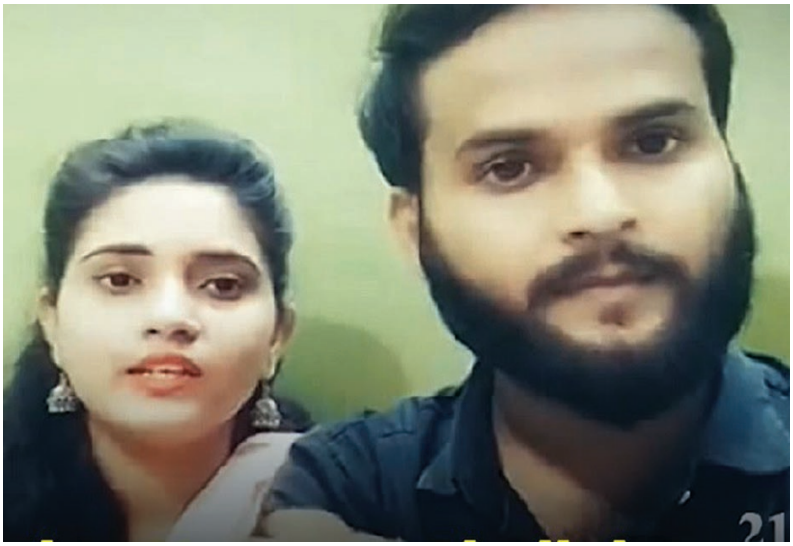

শালিনী, কানপুর

অপূর্বা পুরানিক, কলাচিক

হোদিয়া, কেরল

জিহাদিদের সঙ্গে বাম-তৃণমূলের সেটিঙে পশ্চিমবঙ্গের নাভিশ্বাস

ড. তরুণ মজুমদার

একুশে ফেব্রুয়ারি 'মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা' বলে যারা কেঁদে নয়ন ভাসায়, যারা মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ বলে ন্যারেটিভ নামায়, তারাই বাংলাকে দূরে সরিয়ে রেখে উর্দুকে আপন করে নেয়! ন্যায় বিচারের পরিবর্তে আপন হয় ইনসাফ শব্দটি। গাজা, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন নিয়ে যাদের লেখনী স্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করে সেই তাদের লেখনীই স্তব্ধ হয়ে যায় নোয়াখালিতে পৌঁছে। উর্দুর পরিবর্তে বাংলা পড়তে চেয়ে জীবন বলি দেওয়া রাজেশ, তাপসকে যারা ভুলে যায়, সেই তারাই আনিসকে নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। প্রতিবেশী রুবি খাতুনের হাতে মাত্র চার বছরের শিশু শিবমের নৃশংস হত্যায় যারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, সেই তারাই আখলাকের মৃত্যু নিয়ে রাজপথ দাপিয়ে বেড়ায়। যারা সারা বছর ভারতীয় ঐতিহ্যের অপব্যাখ্যা করে গলার শিরা ফুলিয়ে চিল চিৎকার করে হিন্দু বিদ্বেষ ছড়াতে ব্যস্ত থাকেন, সেই তারাই ইরানে মাতৃশক্তির স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যান। এসবই বিকৃত সেকুলারিজম নামক বিষবৃক্ষের ফল। হয়তো এ কারণেই দণ্ডকারণ্য থেকে মরিচঝাঁপিতে এসে বাঘের খাদ্য হয়ে যেতে হয়েছিল সামান্য খুদ খেয়ে বেঁচে থাকা কয়েকশো হিন্দু শরণার্থীকে।

কলকাতার বুকে আনিসের মৃত্যুর প্রতিবাদে ইনসাফ সভা ডাকা হলো বেছে বেছে ঠিক সেই তারিখেই যেদিন উর্দুর পরিবর্তে বাংলা পড়তে চেয়ে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল রাজেশ আর তাপসের। অর্থাৎ সুকৌশলে সনাতনী সমাজ-মনন থেকে দাড়ি ভিটের ভাষা বলিদানীদের নাম মুছে দেওয়ার অপচেষ্টা চলল সরকারি মদতে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রত্যক্ষ করলেন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত ইনসাফ সভায় সম্পূর্ণ পুলিশি সুরক্ষায় একটার পর একটা মিছিলের সভাস্থলে আগমন অথচ

সেটিং রাজনীতির নগ্ন রূপ

‘চোর ধরো জেল ভরো’ আহ্বান তুলে ১৩ সেপ্টেম্বর নবান্ন অভিযানের দিন অনভিপ্রেত একটি ঘটনা ঘটে। ওইদিন পুলিশের অতি সক্রিয়তার বিরোধিতা করে একটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে উত্তেজিত জনতা। এই ঘটনাকে সামনে রেখে রাজ্য জুড়ে রাজ্য পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে; অভিযুক্তদের বাড়ি বাড়ি কড়া নাড়া হচ্ছে অথচ ভাঙ্গরে পাওয়ার গ্রিড নির্মাণের বিরোধিতার নামে একের পর এক পুলিশ জিপ যখন পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছিল তখন এই রাজ্য পুলিশই জিহাদিদের সামনে প্রায় আত্মসমর্পণ করেছিল। সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ড অ্যাক্টের প্রতিবাদে

রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ মদতে বাম ও জিহাদি শক্তির তাণ্ডবে শয়ে শয়ে বাস, ট্রাক, ট্রেন এমনকী রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত পুড়িয়ে ছারখার করা হয়েছিল। রাজ্য সরকার জবাব দিক তারা জাতীয় সম্পত্তি ধ্বংসকারী কতজন নপুংশককে সেই সময় গ্রেপ্তার করেছিল? ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার সাঁইবাড়ির নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত তদন্ত করার জন্য বিচারপতি অরুণাভ বসুর নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করে। আজও সেই কমিশনের রিপোর্ট জনসমক্ষে কেন আনা হলো না? একইভাবে বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন একুশে জুলাই কমিশনের রিপোর্ট বা বিচারপতি অমিতাভ লালার নেতৃত্বাধীন বিজন সেতু হত্যাকাণ্ড কমিশনের রিপোর্ট কেন চেপে রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার? কাদের আড়াল করার জন্য? নবান্নের চোদ্দ তলায় যে ফিশ ফ্রাই রাজনীতির সুচনা হয়েছিল, একের পর এক বিচারবিভাগীয় কমিশনের রিপোর্ট চেপে যাওয়া কি সেই রাজনৈতিক সেটিঙেরই ফলশ্রুতি? বিগত বিধানসভায় (২০১৬-২০২১) পনেরোটি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বাম ও কংগ্রেসের বিধায়কেরা। এই বিধানসভায় বিজেপি একজন বিধায়ককেও কোনো স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়নি। বিজেপি ব্যতিরেকে অন্য রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে তৃণমূলি সেটিঙের এর থেকে বড়ো উদাহরণ আর কী হতে পারে?

এই রাজ্য পুলিশই রাজ্যের প্রত্যেকটি রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তুলে বিজেপি সমর্থকদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও চূড়ান্ত হেনস্থা করল যাতে ১৩ সেপ্টেম্বরের ঘোষিত নবান্ন যাত্রা বিফল করে দেওয়া যায়।

ত্রিপুরায় বামপন্থীরা যখন ক্ষমতায় সেই

ফঃ ৪

মোমিনপুর দাঙ্গায় আক্রমণের পর পড়ে রয়েছে মন্দিরের ভগ্নাংশ।

সময় দুর্নীতি করে ১১ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীকালে সর্বোচ্চ আদালতের রায়কে মান্যতা দিয়ে বিজেপি চালিত রাজ্য সরকার যখন তাদের বরখাস্ত করে তখন বামেরা মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে ক্রমাগত বলে গেছে যে বিজেপি সরকার শিক্ষকদের চাকরি খেয়ে নিয়েছে। শুধুমাত্র মিথ্যেকে পাথেয় করে পথ চলা এই বামপন্থীদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তৃণমূল কংগ্রেসও একই কায়দায় এরাজ্যে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে প্রতিটা রিক্রুটমেন্ট প্রসেস নিয়ে হাইকোর্টে মামলা হওয়ার কারণেই তারা রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরি দিতে পারছেন না। নিজেদের অপার দুর্নীতিকে তারা এভাবেই নির্লজ্জতার সঙ্গে জাস্টিফাই করে চলেছেন। আর ঠিক এখানেই বস্তুবাদের উপর অসম গুরুত্ব দেওয়া কীট দংশিত বাম রাজনৈতিক দর্শন তার সম্পূর্ণতা খুঁজে পায় কাটমানি সর্বস্ব রাজনৈতিক দর্শনে। আসলে বস্তুবাদের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা বিকৃত সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদের দালালেরা একত্রিত হয়ে একাত্ম মানব দর্শনের প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যকে মিথ্যা প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে ভুল প্রমাণিত করতে চাইছেন। যে দর্শনের মূল প্রোথিত আছে অতীতের ঐতিহ্যশালী ভারতবর্ষে আর দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে ভবিষ্যতের অখণ্ড গৌরবশালী ভারতবর্ষে, সেই দর্শনকে মিথ্যার বেসাতিরা কখনোই ভুল প্রমাণিত করতে পারবেন না— এ প্রত্যয় প্রত্যেক সনাতনী তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করেন। তৃণমূল ও বামেদের মধ্যে রাজনৈতিক যোগসাজশ বা সেটিং যে ফল্গু ধারার মতো বয়ে চলেছে তা গত বছর অগাস্ট মাসে সিপিএমের পলিটব্যুরোর পার্টি নোট থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। পলিটব্যুরো তাদের পার্টি নোটে তৃণমূলের সস্তা পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি বা ডোল রাজনীতিকে জনকল্যাণমুখী বলে চিহ্নিত করেছে। এবছরের গোড়ায় অশোকনগর পুরভোটে বামফ্রন্টের ইস্তেহারে 'সম্মান' নামক একটি প্রকল্পের কথা বলা হয়েছিল যা তৃণমূলি ডোল রাজনীতিরই বর্ধিত রূপ। সম্মান নামক প্রকল্পের মাধ্যমে বাম নেতারা মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে ভোট কিনতে চেয়েছিলেন। ইস্তেহারে বলা হয়েছিল, যে মহিলারা ৫০০ টাকা করে সরকারি সাহায্য পান, তাদের মধ্যে বেশ কিছু মহিলাকে আরও এক হাজার টাকা করে দেবে পুরসভা। এই বামেরাই জিরো বেসড বাজেটিঙের নামে রাজ্যের মানুষকে টুপি পরিয়ে প্রায় দু' লক্ষ কোটি টাকা দেনা করে রাজকোষ শূন্য করে গেছেন আর এদের প্রকৃত উত্তরসূরী তৃণমূল কংগ্রেস সেই দেনার পরিমাণ বাড়িয়ে নিয়ে গেছে প্রায় পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার কোটি টাকায়। লক্ষ্য এদের একটাই। নন মেরিট গুডসের উপর মাত্রাতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করে রাজ্যকে দেশের বাকি অংশ থেকে অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যাতে প্রান্তিক মানুষেরা জিহাদের খপ্পরে পড়ে জাতীয় নিরাপত্তাকে ব্যাহত করার মাধ্যমে এই সব রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে পারেন। তৃণমূল নেতা সাংসদ সৌগত রায়ের মন্তব্যে এই রাজনৈতিক সেটিং তত্ত্বটি আরও পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয়। তৃণমূল চাইছে বামেদের সভায় লোক জোগান দিয়ে বামেদের প্রাসঙ্গিকতা ফিরিয়ে দিতে, যাতে ভোট বিভাজনের মাধ্যমে পুনরায় রাজনৈতিক প্রসাদ আস্বাদন করা যায়। কিন্তু পুজো কমিটিগুলিকে ষাট হাজার টাকা দিলেই হিন্দুরা ভুলে যাবেন না যে এরাজ্যে বিশেষ বিশেষ জায়গায় কিছু বিদ্যালয়ে আজও মা সরস্বতীর আরাধনা করা যায় না, মহামান্য হাইকোর্টে মামলা করে জিতে এসেই তবে এরাজ্যে নির্দিষ্ট শাস্ত্রসম্মত দিনে মা দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া সম্ভব হয়।

বিগত পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে বাঙ্গালি-বিহারি-গুজ্জু-উড়ে নামক বিকৃত প্রাদেশিকতার মন্ত্র উচ্চারণ করে বাম এবং তৃণমূলিরা অত্যন্ত সুকৌশলে হিন্দু জীবনধারাকে ধূলিসাৎ করে এ রাজ্যকে জিহাদিদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত করেছেন। তিন দশকের বেশি সময় ধরে বামেদের দ্বারা মধ্যমেধার চাষ এবং বিগত এক দশক ধরে তৃণমূলি প্রশ্রয়ে নিম্ন মেধার অসহনীয় আস্ফালন সমাজে ভারতীয় ঐতিহ্যের আধারস্বরূপ উচ্চ মেধাকে ক্রমাগত তিরস্কার করে চলেছে যাতে অতীত ঐতিহ্যশালী গৌরবের কথা ভুলে আমরা মধ্যযুগীয় বর্বতার অধীনে শান্তি খুঁজে পাই আর এই সুযোগে রাজনীতির এই দালালেরা রাজনৈতিক প্রসাদ লাভ করে চুরি জোচ্চুরিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সমর্থ হন। তৃণমূল ও বামেরা বস্তুত একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। রাত্রির কাছে সূর্যালোক চাওয়া যেমন বোকামি; তৃণমূল, বাম ও জিহাদিদের কাছে সততা ও জাতীয়তাবোধ আশা করাটা তেমনই মূর্খামি। পেট্রো-ডলার এবং চুরি ও লুটের অর্থে বলিয়ান রাজনৈতিক নেতারা ভুলে যান, তারা এমন এক ঐতিহ্যবাহী জীবনধারাকে ধ্বংস করে নিজেদের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে অন্ধকার যুগ ফিরিয়ে আনতে চান, যে জীবনধারার শিরা-উপশিরায় উচ্চারিত হতে থাকে তমসো মা জ্যোতির্গময়।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার সময় এসেছে। যে জাতি একদিন গৈরিক পতাকার তলে কাবুল থেকে সুমাত্রা পর্যন্ত রাজত্ব করত আজ তারা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, মাঝে আছে কয়েকশো মিনি পাকিস্তান। এর জন্য দায়ী ক্ষণস্থায়ী সুবিধার প্রতি লালায়িত জনতার একাংশ এবং নীতিহীন ও জাতীয়তাবোধ রহিত রাজনীতির কারবারিরা। □

আগাগোড়া ব্রিটিশ, খোলাখুলি হিন্দু ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

শিতাংশু গুহ

আলোর উৎসব 'দিওয়ালি'-র মাহেন্দ্রক্ষণে একদা 'সূর্য অস্ত না যাওয়া' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী লন্ডনে গত ২৪ অক্টোবর ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্র্যাক্টিসিং হিন্দু ঋষি সুনক-এর নাম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দিকে দিকে আনন্দোৎসব শুরু হয়ে যায়। পুরো ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ, বিশেষত হিন্দু সমাজ খুশিতে আপ্লুত হয়। প্রায় একই সময়ে ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তানকে পরাজিত করে। এজন্য নিউইয়র্ক সিটি স্কুলে 'দিওয়ালি' ছুটি ঘোষিত হয়। শুধু তাই নয়, এ বছর হোয়াইট হাউসে সাড়ম্বরে 'দিওয়ালি' উৎসব পালিত হয়েছে। ১০নং ডাউনিং স্ট্রিট, অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আবাসস্থলে 'দিওয়ালি' পালন করা হয়।

২৮ অক্টোবর ঋষি সুনক আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নিয়েছেন। তিনি প্রথম অশ্বেতাঙ্গ, প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত, প্রথম হিন্দু এবং ব্রিটেনের দুশো বছরের ইতিহাসে সর্ব-কনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী। ১২ মে ১৯৮০ ব্রিটেনের ইয়র্কশায়ারে ঋষি সুনকের জন্ম, বয়স মাত্র ৪২। প্রকৃতির কী সুমধুর প্রতিশোধ, যে ব্রিটিশ ২০০ বছর ভারত শাসন করেছে, মাত্র ৭৫ বছরের ব্যবধানে একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটেন শাসন করবেন! সুনাক কনজারভেটিভ টোরি পার্টির প্রধান, একদা কিংবদন্তী উইনস্টন চার্চিল এই পার্টির প্রধান ছিলেন। ঋষি সুনাকের ভাষায় : 'আমি আগাগোড়া ব্রিটিশ, গ্রেট-ব্রিটেন আমার দেশ, বাড়ি। তবে আমার ধর্ম ও সংস্কৃতির শিকড় ভারতবর্ষ। আমার স্ত্রী ভারতীয়। আমি খোলাখুলিভাবে হিন্দু'।

ঋষি সুনকের পিতামহের বাস ছিল অখণ্ড ভারতের গুজরানওয়ালা। সেদিক থেকে পাকিস্তানিরা খুশি এবং তারা সুনক পাকিস্তানি বলে দাবি করছেন। সুনকের বাবা যশবীর কেনিয়ায় যান। পেশায় ডাক্তার ছিলেন, মা তাঞ্জানিয়ার, পেশায় ফার্মাসিস্ট। তাঁর ঠাকুরদা পঞ্জাব থেকে আফ্রিকায় বসবাস শুরু করেন। সুনক বিখ্যাত অক্সফোর্ডের স্নাতক। এমবিএ করেন স্ট্যানফোর্ড থেকে। পত্নী অক্ষতা সাউথ ইন্ডিয়ান। অক্ষতার মা সুধা মূর্তি টাটা মোটরসের প্রথম নারী প্রযুক্তিবিদ। স্ট্যানফোর্ডে প্রণয় থেকে পরিণয় সুনক-অক্ষতার। ৪২ বছর বয়সি অক্ষতা পেশায় ফ্যাশন ডিজাইনার। ২০১০ সালে নিজের ফ্যাশন ব্র্যান্ড 'অক্ষতা ডিজাইন্স' গড়ে তোলেন। সানডে টাইমসের শীর্ষ ধনীর তালিকায় তাঁর নাম আছে। প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের সম্পদের থেকেও তাঁর সম্পদ

বেশি। রানির ছিল প্রায় ৪৬ কোটি ডলার। অক্ষতার শুধু ইনফোসিসেই আছে ১০০ কোটি ডলার মূল্যের শেয়ার। বিবিসি অক্ষতাকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

ঈশ্বর সুনক-কে আশাতিরিক্ত দিয়েছেন। একেই বলে কপাল। এক জার্মান ইয়ং মহিলা নাকি ৬০-এর দশকে দিল্লিতে এসে একটি ট্যাক্সি ক'দিনের জন্যে ভাড়া করেন। ড্রাইভারের নাম ছিল গোপাল। কিছুদিন চলাফেলার পর সেই মহিলা ড্রাইভারের প্রেমে পড়েন এবং তাঁকে বিয়ে করে জার্মানি নিয়ে যান। এরপর থেকেই লোকে বলে, 'কপালের নাম গোপাল'। তবে সুনকের যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ হবে না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং ঋষি সুনাকের রাজনৈতিক উত্থান অনেকটা একই রকমের হলেও মসৃণ ছিল না। ওবামা সফল হয়েছেন, সুনক কি টিকে থাকতে পারবেন? রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে পুরো বিশ্ব তটস্থ। অর্থনীতি বিপর্যস্ত। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ঋষি সুনাক-কে যুদ্ধ বন্ধে উদ্যোগী হতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১০নং ডাউনিং স্ট্রিট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল, সুনক কি পারবেন যুদ্ধ থামাতে বা উত্তেজনা কমাতে? সুনক কি পারবেন এক হাতে হোয়াইট হাউস, অন্য হাতে ক্রেমলিন সামলাতে? কমলা হ্যারিস বা নরেন্দ্র মোদীকে কি সঙ্গে পাবেন? আগামী দিনেই এর উত্তর পাওয়া যাবে।

মহারাষ্ট্রে প্রণব কন্যা সঙ্ঘের জগদ্ধাত্রী পূজা

মুম্বাই শহর থেকে ষাট কিলোমিটার পথ পেরিয়ে ঠানে জেলার নালাসোপারার মেরেগাঁও অঞ্চলে মহা সমারোহে পালিত হলো জগদ্ধাত্রী পূজা। ভারত সেবাশ্রম

সঙ্ঘের শাখা সংগঠন প্রণব কন্যা সঙ্ঘের পরিচালনায় পূজ্যা সন্ন্যাসিনী আত্মস্বরূপানন্দময়ীর উদ্যোগে ধর্মীয় আচরণ বিধি মেনে সম্পন্ন হয় পূজা। দেবী মূর্তির পাশেই পূজিত হলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। পূজায় পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন শ্রদ্ধেয়া ব্রহ্মচারিণী বীথি। মন্ত্রপাঠ করেন পূজ্যা মাতা আত্মস্বরূপানন্দময়ী। আশ্রমের সেবিকা ও কর্মীরা ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে মেতে ওঠেন পূজার আনন্দে। কন্যালয়ের ছাত্রীরা আশ্রমিক পোশাকে ঢাক-ঢোল-কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে আনন্দমুখর করে তোলে পূজামণ্ডপ। আশ্রম পরিসরে একটি বুক স্টল দেওয়া হয়। মহানবমীর পূজা সমাপন্তে আশ্রমের ভোজনালয়ে তিনশতাধিক ভক্তকে ভোগ প্রসাদ পরিবেশন করা হয়। দশমীর দিন গোধূলিবেলায় নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রমের পাশের জলাশয়ে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়।

মালদহে জেলা শাসক ও খাদ্য সরবরাহ দপ্তরে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের ডেপুটেশন

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ মালদহ জেলার পক্ষ থেকে গত ২৮ অক্টোবর কৃষকদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে জেলা শাসক ও জেলা খাদ্য সরবরাহ অফিসে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি কল্যাণ কুমার মণ্ডল, মালদা জেলা সভাপতি চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস,

জেলা সম্পাদক গুপ্তেশ্বর চৌধুরী, অর্গানিক প্রমুখ পার্থ চক্রবর্তী। ডেপুটেশন দেওয়ার আগে পথসভায় বক্তব্য রাখেন গুপ্তেশ্বর চৌধুরী, পরেশ চন্দ্র সরকার, নিখিল চন্দ্র মজুমদার ও রাজ্য সভাপতি কল্যাণ কুমার মণ্ডল। স্মারকলিপি দানের পর জেলা শাসক মহাশয় কৃষকদের দাবি যথাযথ বলে মন্তব্য করেন। একইভাবে খাদ্য নিয়ামক মহাশয় কৃষকদের থেকে ধান কেনার বিষয়ে সমস্যাগুলি শোনেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। উল্লেখ্য, এরকম ডেপুটেশন রাজ্যের জেলায় জেলায় প্রদান করা হয়।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দুর্গাবাহিনী ও মাতৃশক্তি প্রশিক্ষণ শিবির

উত্তরবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দুর্গাবাহিনী ও মাতৃশক্তির পাঁচদিবসীয় প্রান্ত প্রশিক্ষণ শিবির গত ১৯ থেকে ২৩ অক্টোবর কোচবিহার শহরের সারদানগরের সারদা শিশুতীর্থে সম্পন্ন হয়। শিবিরে ১৬০ জন মা-বোন অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন সিকিম বিদ্যার্থী পরিষদের পবিত্রা নাদান, উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সংযোজক বিভা সরকার, মাতৃশক্তি সংযোজক অনিতা গুহ এবং দুর্গাবাহিনীর সংযোজক সরস্বতী রাজভর।

এক সন্ন্যাসী রাজকুমারকে আজও মনে রেখেছে তিব্বত

তন্বী শুকুল

ভারতের ইতিহাস বর্ণময়, ঐতিহ্যপূর্ণ এবং অত্যন্ত গৌরবের। ভারতবাসীরা চিরকালই নির্ভীক, বীর, জ্ঞানপিপাসু, ধার্মিক ও উদার। ভারতীয় মূল্যবোধ ও জীবনশৈলী এক সময় ছিল জগতের কাছে উদাহরণস্বরূপ। জ্ঞানের আলো এদেশ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজুড়ে। এদেশে নানা সভ্যতা গড়ে উঠেছে আবার তা ধ্বংসও হয়েছে কিন্তু জ্ঞানের চর্চার বিরাম কখনো হয়নি। তাই তো বারে বারে এদেশের অনেক রাজকুমার রাজপ্রাসাদের বিলাসবৈভব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন মুক্তির পথের সন্ধানে, জ্ঞান আহরণের জন্য। তা সে গৌতম বুদ্ধই হোন বা তাঁরও আগের বা পরের কেউ হোন। কিন্তু সময়ের কী নির্মম পরিহাস! আজ সেই মহান মানুষদের আমরা ভুলে গেছি। ভুলে গেছি তাদের অবদান, নির্ভীক, সাত্ত্বিক ত্যাগময় জীবন। কিন্তু সময়ই কি এর জন্য একমাত্র দায়ী নাকি এই ইতিহাস ইচ্ছে করে আমাদের ভোলানো হয়েছে? কারণ পরাজিত জাতির কোনো গৌরবময় অতীত থাকলে তো শাসকদের খুবই অসুবিধা। তাই আমাদের পরাজয়ের মিথ্যা ইতিহাস জোর করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গেলানো হয়েছে। আর আমরা বোধহয় এইজন্যই নিজেদের দুর্বল, অন্তর্বিবাদী, ষড়যন্ত্রকারী জাতি হিসেবে ভেবে চলেছি।

ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ, যুগ যুগ ধরে যার সম্পদের উপর বিদেশিদের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে। আগ্রাসী দৃষ্টি নিয়ে তারা বার বার আক্রমণ করেছে। এই দেশের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেছে বার বার। কিন্তু আমরা আজও নিঃস্ব রিক্ত হয়ে যাইনি। শক, হুন, পাঠান, মুঘল, পর্তুগিজ, ইংরেজ আরও কত লুণ্ঠনকারী এদেশে এসেছে শুধুমাত্র সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যেতে। এতদসত্ত্বেও ভারতবর্ষ কখনো নিঃস্ব, দরিদ্র হয়নি। বাইরের শত্রুরা যা লুটে নিয়ে গেছে তা তো শুধুমাত্র বাহ্যিক সম্পদ, ভারতের আসল সম্পদ রয়েছে তার অন্তরে, সংস্কৃতিতে, শিক্ষায়।

যে বাহ্যিক সম্পদ বাইরে থেকে বার বার বহিঃশত্রুর আক্রমণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এদেশের বহু রাজকুমার অতি সহজেই তা বিসর্জন দিয়ে বেছে নিয়েছেন এমন এক অমূল্য সম্পদ যা শুধুমাত্র অর্জন করা যায়, বিতরণ করা যায় কিন্তু অপহরণ করা যায় না। জ্ঞানের অমোঘ আকর্ষণ বার বার খুলে দিয়েছে নতুন পথের, নতুন মতের। নতুন করে বিশ্বকে দেখিয়েছে নতুন আলোর দিশা।

শুধুমাত্র কপিলাবস্তুর রাজকুমার গৌতমবুদ্ধই নন, আরও অনেক রাজকুমার রাজসুখ বিসর্জন দিয়ে মানুষের ও সমাজের মুক্তির জন্য সাধনার পথ বেছে নিয়েছিলেন। এর জন্য ইতিহাসের পথ ধরে আমাদের চলে যেতে হবে আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে। গঙ্গা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, বুড়িগঙ্গা ও ইছামতি দিয়ে ঘেরা এক শ্যামল, ছায়াঘন অঞ্চলে। কথিত আছে মহারাজা বিক্রমাদিত্য কোনো এক দূর দেশ থেকে ফেরার পথে এখানে এসে প্রকৃতির কোমল রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে এখানেই রাজধানী স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এতো গেল বহু প্রাচীন এক কাহিনি। কিন্তু এর পরও গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল, বহু রাজনৈতিক

পট পরিবর্তন হয়েছে।

সময়টা দশম শতাব্দীর শেষের দিক। মগধের সিংহাসনে তখন পাল সম্রাট মহীপাল। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। এই সময় পালরাজের এক সামন্ত রাজ্য বিক্রমপুরের রাজা কল্যাণশ্রী ও রানি প্রভাবতীর দ্বিতীয় সন্তান চন্দ্রগর্ভ জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে চন্দ্রগর্ভের জন্ম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই রাজকুমারের কীর্তির জন্যই এই বাজবংশের নাম ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে এবং থাকবেও। কিন্তু আমরা এই মহামানবের নাম প্রায় ভুলতে বসেছি।

অবশ্য রাজকুমার চন্দ্রগর্ভ নামে তিনি পরিচিত নন। যে নামে আমরা তাঁকে চিনি তা হলো কালজয়ী জ্ঞানীপুরুষ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তাঁর জীবন রোমাঞ্চকর সব ঘটনায় ঘেরা। তিনি বাঙ্গালির সাহসের মূর্ত প্রতীক। যে বাঙ্গালি জাতির পূর্বসূরি স্বয়ং শ্রীজ্ঞান সেই বাঙ্গালি কখনোই ভীরু, অলস হতে পারে না। কারণ আমাদের ধমনিতেও বইছে শ্রীজ্ঞানের রক্ত, যিনি ৫৮ বছর বয়সে দুর্গম তিব্বতের পথে পদব্রজে যাত্রা করেছিলেন।

রাজপরিবারের কুলধর্ম অনুসারে বজ্রযান বৌদ্ধ ধর্মের রীতি নীতি অনুসারে চন্দ্রগর্ভের দীক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। কিন্তু তাঁর জ্ঞানের পিপাসা ক্রমেই বেড়ে চলে। কথিত আছে যে রাজ পরিবারের ষড়যন্ত্র, কূটনীতি, লোভ, লালসা, প্রাচুর্য ও ভোগবিলাসে চন্দ্রগর্ভ ক্লান্ত হয়ে শান্তির খোঁজ করছিলেন। এমন সময় একদিন একা তিনি অশ্বচালনা করে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন এবং পথ হারিয়ে ফেলেন। এই অরণ্যে তিনি মহর্ষি জিতারীর সাক্ষাৎ পান। রাজকুমার চন্দ্রগর্ভ মাত্র ১১ বছর বয়সে জ্ঞান আহরণের জন্য গৃহ থেকে অনেক দূরে মহর্ষি জিতারীর আশ্রমে গমন করেন। মহর্ষি জিতারী তাঁকে জ্যোতিষ, শাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান ও ব্যাকরণের শিক্ষা দেন। ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত মহর্ষি জিতারীর কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর চন্দ্রগর্ভ দেশের তথা সারা বিশ্বের শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। বিক্রমপুর থেকে নালন্দার দূরত্ব ৬২৬ কিলোমিটার। এই সুদীর্ঘ পথ তিনি পায়ে হেঁটেই গিয়েছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ বছর তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ইতিমধ্যে দেশের আরেক প্রান্তে অবস্থিত ওদন্তপুরী মহাবিদ্যালয়ের এক আচার্য মহান শীলরক্ষিতের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে তা চন্দ্রগর্ভের কর্ণগোচর হয়। শীলরক্ষিতের কাছে শিক্ষা লাভের জন্য চন্দ্রগর্ভ নালন্দা থেকে তৎকালীন ওড্ডীয়মান প্রদেশ অর্থাৎ বর্তমানের ওড়িশাতে যাত্রা করেন। ওদন্তপুরীতে পৌঁছে শীলরক্ষিতের কাছে শিক্ষা লাভের পথ চন্দ্রগর্ভের খুব একটা সহজ হয়নি। নিজ বংশের নিয়ম অনুযায়ী চন্দ্রগর্ভ ছিলেন বজ্রযান বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত। তন্ত্র সাধনা ছিল তাঁর অন্যতম অঙ্গ। শীলরক্ষিতের কাছে দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় চন্দ্রগর্ভের কুলধর্ম। প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে চন্দ্রগর্ভের কঠিন অধ্যাবসায়, তীক্ষ্ণ মেধা এবং শীলরক্ষিত প্রদত্ত সব পরীক্ষায় চন্দ্রগর্ভ উত্তীর্ণ হলে শীলরক্ষিত তাঁকে দীক্ষা দেন। একমাত্র এই শর্তে রাজি হয়েছিলেন যে দীক্ষান্তে তাঁর সঙ্গে বজ্রযান তন্ত্র সাধনার কোনোরকম সম্পর্ক থাকবে না। চন্দ্রগর্ভ এই শর্তে রাজি হলে অবশেষে তাঁর দীক্ষা সম্পূর্ণ হয়। শুরু হয় তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায়। এখানেই শেষ হয় চন্দ্রগর্ভের কাহিনি। জন্ম হয় এক কালজয়ী মহামানবের।

মহর্ষি জিতারীর কাছে যে চন্দ্রগর্ভের ১১ বছর বয়সে জীবনের বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম পথ শুরু হয়েছিল, বৌদ্ধ ধর্মের মূল তিনটি স্তম্ভ— বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচয় হয়েছিল তাঁর হাত ধরে। এবার আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে বিশুদ্ধ মহাযান বৌদ্ধধর্মের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে ২৯ বছর বয়সে জন্ম নিল এক অনির্বাণ দীপ— অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

ওদন্তপুরী মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পর অতীশ মহাযান বৌদ্ধমতের অসাধারণ কিছু তত্ত্ব ও ধারণার জন্ম দিলেন। তাঁর গুরু আচার্য শীলরক্ষিত বিস্মিত হয়ে পড়লেন, স্বীকার করলেন অতীশ পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে তাঁর চেয়ে অনেক উচ্চমার্গে অবস্থান করছেন। অতীশের জন্য তিনি গর্ব বোধ করলেন। কিন্তু আক্ষেপের সঙ্গে বললেন যে এর চেয়ে অধিক মহাযান পন্থার জ্ঞানী কেউ এদেশে নেই। একমাত্র সুবর্ণদ্বীপের আর্য ধর্মকীর্তিই এর অধিক এই বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে সুবর্ণদ্বীপের দূরত্ব অনেক। শুধু তাই নয়, বিপদসংকুল সমুদ্র পেরিয়ে পৌঁছতে হবে সে দেশে। জ্ঞান আহরণের প্রবল পিপাসা যাঁর মধ্যে আছে সে কি আর পথের বাধা মানে?

অবশেষে ১০২৪ খ্রিস্টাব্দে ৩০ বছর বয়সে কয়েকজন রত্ন ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিপদসংকুল ও ঝড়ঝঞ্ঝাপূর্ণ পথে তিনি পাড়ি দিলেন সুবর্ণদ্বীপের উদ্দেশে। বার্মা ও মালয় উপকুল হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি পৌঁছালেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত সুবর্ণদ্বীপে। কিন্তু তাঁর এই যাত্রা মোটেই সুগম হয়নি। তাঁদের অর্ণবপোত সমুদ্র ঝঞ্ঝায় ডুবে গেলে বহু কষ্টে কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে তীরে পৌঁছেছিলেন। তখনকারদিনে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তাঁর শিষ্যদের এক খানা পরিচয়লিপি প্রদান করতেন, অনেকটা এযুগের এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেটের মতো। কিন্তু সমুদ্রের ওই ভীষণ ঝঞ্ঝায় অতীশের আচার্য শীলরক্ষিত দ্বারা প্রদত্ত সেই পরিচয়পত্র হারিয়ে যায়। এই অবস্থায় অতীশ আচার্য ধর্মকীর্তির সম্মুখে উপস্থিত হলে তিনি তাঁর পরিচয় চান। নিঃস্ব, ক্লান্ত, পরিচয়পত্র হীন অতীশ ভেঙে না পড়ে ঋজু হয়ে উত্তর দেন যে তাঁর বিদ্যা ও শিক্ষাই হলো তার আসল পরিচয়। সুতরাং আচার্য ধর্মকীর্তির সম্মুখেও অতীশকে পড়তে হয় কঠিন পরীক্ষার সামনে। কিন্তু তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিদ্যার জোরে তিনি এই পরীক্ষাতেও সহজেই শুধু উত্তীর্ণ হন না, গুরুর মনও জয় করে নেন। সুবর্ণদ্বীপে আচার্য ধর্মকীর্তির কাছে শুরু হয় তাঁর পাঠ। সুবর্ণদ্বীপে তিনি ১২ বছর সময় অতিবাহিত করেন।

এখানে সুবর্ণদ্বীপের কথা একটু না বললেই নয়। সুবর্ণদ্বীপ অর্থাৎ বর্তমানের মালয়েশিয়া, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও— এই সব অঞ্চলে প্রায় ৩০০ বছর ধরে গড়ে উঠেছিল শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধধর্ম চর্চা ও গবেষণার পৃষ্ঠপোষক। ফলে সুবর্ণদ্বীপ হয়ে ওঠে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্যতম

পীঠস্থান। বহু মহামূল্যবান বৌদ্ধ গবেষণাপত্র, পুঁথি ও অমূল্য সব গ্রন্থের সমাহার হয় এখানে।

অচিরেই সুবর্ণদ্বীপ হয়ে ওঠে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের অন্যতম আকর্ষণের স্থান ও তীর্থক্ষেত্র। এই ১২ বছর সময়কালে অতীশ মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনেক দূরূহ তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেন। তাঁর এই সহজ সরল ভাষ্য শুনে আচার্য ধর্মকীর্তি অত্যন্ত গর্ববোধ করলেন। বিদ্যাচর্চায় যখন এই দুই পণ্ডিত অত্যন্ত মগ্ন, সুবর্ণদ্বীপের আকাশে তখন দেখা দিল আগ্রাসী চোল সাম্রাজ্যের আক্রমণের কালো মেঘ। আক্রমণ শুধুমাত্র রাজপ্রাসাদ বা সৈন্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। বৌদ্ধ মঠ ও মন্দিরও আক্রান্ত হলো। অতীশ ভারতীয় বণিকদের সহায়তায় কোনোমতে সেই দেশ থেকে পলায়ন করতে পারেন। কিন্তু এর পরে ইতিহাসে আচার্য ধর্মকীর্তির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

আচার্য ধর্মকীর্তিও ছিলেন রাজকুমার। তিনি ছিলেন শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের ছোটো রাজকুমার। কিন্তু বুদ্ধদেবের জীবন ও তাঁর উল্লেখিত মার্গ ধর্মকীর্তিকে এতটাই প্রভাবিত করে যে তিনি শান্তি ও মুক্তির খোঁজে গৃহত্যাগ করেন এবং ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এখানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সম্পূর্ণ করার পর ভারতের বহু স্থান পরিভ্রমণ করে অবশেষে তিনি সুবর্ণদ্বীপে ফিরে আসেন এবং বিশুদ্ধ মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করেন। এই হলো আচার্য ধর্মকীর্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

কিন্তু এখানে আমাদের মূল চরিত্র হলেন অতীশ। তিনি প্রায় ৪০ বছর বয়সে দেশে ফিরে এলে পাল সম্রাট বিপুল সংবর্ধনা দেন এবং বিক্রমশীলা মহাবিহারে অধ্যাপনার জন্য অনুরোধ করেন। অতীশ পাল সম্রাটের এই অনুরোধ স্বীকার করে বিক্রমশিলা মহাবিহারে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। এখানে প্রায় ১৮ বছর অতীশ অধ্যাপনার কাজ করেন। রচনা করেন অমূল্য সব গ্রন্থ।

বৌদ্ধধর্ম ভারতে উৎপত্তি হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নানা দেশে ও প্রান্তে ছাড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ ঘটেছিল সম্রাট অশোক এবং তার পরবর্তী সময়ে। ভারতের উত্তরে হিমালয়ের কোলে দুর্গম পর্বতঘেরা, রহস্যাবৃত দেশ হলো তিব্বত। এই তিব্বতেও পৌঁছেছিল বৌদ্ধধর্মের ঢেউ। অতীশের প্রায় ১৫০০ বছর আগেই তিব্বতের জনগণের সঙ্গে এই ধর্মের পরিচয়। প্রথমে মহাযান বৌদ্ধধর্ম এখানে এলেও কিছুদিন পরে ভারতের পশ্চিম প্রান্ত থেকে একজন বৌদ্ধ গুরু পদ্মসম্ভব তিব্বতে আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন তন্ত্র প্রধান বজ্রযান বৌদ্ধ মত। অচিরেই এই বজ্রযান ধর্মের তন্ত্র সর্বস্ব আচারের আড়ালে বৌদ্ধধর্মের সরল ও অনাড়ম্বর পথ থেকে অনেক দূরে সরে যেতে লাগলো।

শ্রীজ্ঞানের অগাধ মেধা, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের খবর ভারতের নানা প্রান্তে যেমন ছাড়িয়ে পড়েছিল, সেই রকম ভারতের বাইরেও তা প্রচার লাভ করেছিল। এই খবর হিমালয় পেরিয়ে তিব্বতেও পৌঁছেছিল। তিব্বতের তখন রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা চলছে। রাজবংশের অন্তর্কলহ, বহিঃশত্রুর আক্রমণে একদিকে যেমন রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছিল অন্যদিকে তন্ত্রমন্ত্রের বেড়াজালে আক্রান্ত মানুষের সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও নীতির অভাব সমগ্র তিব্বতের পক্ষে খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল ক্রমশ। তিব্বতের এইরকম সংকটপূর্ণ অবস্থায় রাজকুমার জ্ঞানপ্রভ শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে আসার অনুরোধ করার জন্য দুর্গম পর্বত পেরিয়ে বিক্রমশীলা মহাবিহারে আসেন।

বিক্রমশীলা মহাবিহারে পৌঁছে জ্ঞানপ্রভ প্রথমে শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে যাওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু তার প্রথম অনুরোধ অচিরেই মহাবিদ্যালয় কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু তিনি দমে যাননি। এরপর জ্ঞানপ্রভ সরাসরি পাল সম্রাট নয়পালের কাছে তাঁর কাতর আর্জি জানান। অনেক কষ্টে জ্ঞানপ্রভ শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে নিয়ে যাওয়ার এই শর্তে অনুমতি পান যে কার্য সমাধা করে শ্রীজ্ঞানকে পুনরায় বিক্রমশীলাতে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এই অনুমতি আদায় করতে ও যাত্রার প্রস্তুতি করতে কেটে গেছে বেশ কিছুটা সময়। অবশেষে ৫৮ বছর বয়সে শ্রীজ্ঞান দুর্গম, পার্বত্য, বিপদসংকুল ও দস্যুপূর্ণ পথে জ্ঞানপ্রভ এবং অতীশের অনুচর ভিক্ষুর একটি ছোটো দল তিব্বতের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন।

শ্রীজ্ঞানের এই তিব্বত যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তন্ত্র, মন্ত্র ও জাদুর নাগপাশ থেকে বৌদ্ধধর্মের আসল ও সরল রূপটিকে পুনরুদ্ধার করা। বিক্রমশীলা থেকে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। তাঁর যাত্রাপথ ছিল নালন্দা, বুদ্ধগয়া হয়ে নেপাল আর নেপাল থেকে তিব্বত। শ্রীজ্ঞানের এই ক্ষুদ্র দলটি নেপাল পৌঁছালে তৎকালীন নেপাল রাজ শ্রীজ্ঞানকে অনুরোধ করেন তিনি যেন কমপক্ষে এক বছর নেপালে অবস্থান করে নেপালকে তাঁর জ্ঞানের আলোকে আলোকিত ও সমৃদ্ধ করেন। শ্রীজ্ঞান নেপাল রাজের অনুরোধে সেখানে কিছুকাল থেকে যান। তাঁর এই নেপালে অবস্থানকালে যাত্রা পথের বর্ণনা ও সমগ্র পথের মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধার্মিক জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি পাল সম্রাট নয়পালকে একখানা পত্র লেখেন। তাঁর এই পত্র ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল। এই পত্র 'বিমলরত্নলেখ' নামে সুপ্রসিদ্ধ। আজও এই পত্র বৌদ্ধধর্মের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান নথি।

তাঁর যাত্রাপথ যেমন প্রাকৃতিক দিক থেকে দুর্গম ছিল তেমনি ছিল ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর দস্যু দ্বারা পরিপূর্ণ। ভিক্ষুদের যাত্রাপথে এই দস্যুদের আক্রমণ ছিল খুবই মারাত্মক। সাধারণত এই ভিক্ষুদের কাছে মূল্যবান কোনো সামগ্রী থাকত না। ফলে কিছু না পেয়ে দস্যুরা নির্মমভাবে তাদের হত্যা করত। কথিত আছে শ্রীজ্ঞানও তাঁর যাত্রাপথে এইরকম এক দস্যুর হাতে আক্রান্ত হন। তাদের সঙ্গে থাকা মূল্যবান গ্রন্থ ও পুঁথি দস্যুদল মূল্যবান ধনরত্ন ভেবে ভুল করে কেড়ে নেয়। শ্রীজ্ঞান একটুও বিচলিত না হয়ে অত্যন্ত শান্তভাবে দস্যু সর্দারের সম্মুখীন হন এবং দস্যু সর্দারকে বিস্মিত করে দিয়ে তিনি আহত সর্দারের শুশ্রূষা করেন। শ্রীজ্ঞানের নির্ভীক শান্ত দৃষ্টি ও তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী দস্যু সর্দারের মনের পরিবর্তন করে। শ্রীজ্ঞানের পদতলে বসে সে ক্ষমভিক্ষা করে ও শাস্তি চায়। শ্রীজ্ঞান তৎক্ষণাৎ তাকে ক্ষমা করেন ও শাস্তিস্বরূপ তাকে এই পথে আগত যাত্রীদের নিরাপত্তা ও বিশ্রামের জন্য বিশ্রামাগার স্থাপনের নির্দেশ

দেন। এই হলো তাঁর শিক্ষা ও মহানুভবতার পরিচয়।

পথের বহু বাধাবিপত্তি পেরিয়ে শ্রীজ্ঞান অবশেষে তিব্বতে পৌঁছান। এখানে পৌঁছে শুরু হয় তাঁর জীবনের এক নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এখানে এসে প্রথমেই তিনি উপলব্ধি করলেন যে বৌদ্ধ ধর্মের সরল ও স্বাভাবিকরূপটি এখানে রহস্যময় তন্ত্র, মন্ত্র ও বিভিন্ন জাদু ও আচারসর্বস্ব বজ্রযান মতের নীচে সম্পূর্ণ ভাবে চাপা পড়ে গেছে। বৌদ্ধ মঠগুলি সাধারণ মানুষের কাছে ভক্তি নয়, ভয়ের জায়গায় পরিণত হয়েছে। জনসাধারণ পথভ্রষ্ট। এর মূল কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে শ্রীজ্ঞান প্রথমেই যা অনুধাবন করলেন তা হলো সাধারণ মানুষের কাছে বৌদ্ধধর্ম দুর্বোধ্য ও কঠিন। কারণ অধিকাংশ বৌদ্ধ পুঁথিই ছিল সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সুতরাং এই গ্রন্থ বা পুঁথি পাঠ করা বা তার অর্থ বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে ছিল অসাধ্য। এই অবস্থায় শ্রীজ্ঞান সিদ্ধান্ত নেন যে সমস্ত পুঁথি তিনি তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করবেন। তিব্বতীয় ভাষা শ্রীজ্ঞানের জানা না থাকলেও তাঁর সঙ্গে অনেক অনুবাদক ছিলেন তাঁদের সাহায্যেই তিনি ওই স্থানের প্রায় সব পুঁথিই তিনি সংস্কৃত থেকে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

শ্রীজ্ঞান প্রথমে তিব্বতে এসে মানস সরোবর অঞ্চলে উপস্থিত হন। এখানে তিনি ৩ বছর সময় অতিবাহিত করেন। তিব্বতের রহস্যময় শান্ত প্রকৃতিতে শ্রীজ্ঞান তৎকালীন বৌদ্ধধর্মের আমূল সংস্কার করলেন। প্রচার করলেন বৌদ্ধধর্মের আদি ও খাঁটি রূপ মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের। বৌদ্ধধর্ম বজ্রযানের তন্ত্রমন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে জনসাধারণের ধর্মে পরিণত হলো। মহাযান বৌদ্ধধর্ম হয়ে উঠল জনসাধারণের পথের ও মুক্তির দিশা। তিব্বতের জনগণ শ্রীজ্ঞানকে অভিহিত করলেন অতীশ নামে, যার অর্থ হলো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এই ভাবে ভারতবর্ষ থেকে আগত এক সন্ন্যাসী নিঃস্বার্থ ভাবে মাতৃভূমি থেকে বহু দূরে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য এতো দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এই দুঃসাধ্য কাজ করলেন। তিব্বতীয় ভাষায় ওখানের মানুষ তাঁকে 'জোবজে' অর্থাৎ প্রভু নাম সম্বোধন করতেন। মানস সরোবরে বসবাস কালে অতীশ রচনা করলেন তাঁর জীবনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বোধ পথ প্রদীপ'। মূল গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা হলেও তিনি দ্রুত এর তিব্বতীয় অনুবাদও করে ফেলেন। এটি একটি অত্যন্ত দুর্লভ ও অমূল্য গ্রন্থ। ইতিহাস ও সাহিত্য দুই দিক থেকেই এই গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। এখানে তিনি মোট সাতষট্টিটি অনুচ্ছেদে বৌদ্ধ ধর্মের তিনটি মূল মত--- মহাযান, বজ্রযান ও হীনযানের বৈশিষ্ট্য খুব সরল, স্বাভাবিক ও বিস্তারিত ভাবে লিখে গেছেন। এই গ্রন্থ বৌদ্ধ ধর্মের এক অসামান্য দলিল।

এর কিছুদিন পর ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দে অতীশ তিব্বতের সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ সাম্য বিহারে যাত্রা করেন। এই মঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্গেও বঙ্গ তথা ভারতবর্ষের এক নিবিড় যোগাযোগ আছে। আমরা এখানে সাম্য বিহারের কথা একটু জেনে নিই। অতীশের জন্মের প্রায় দুশো বছর আগে অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে রাজত্ব স্থাপন করেছেন পাল সাম্রাজ্যের প্রথম নৃপতি গোপাল। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। এই সময়ে একজন রাজকুমার সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। তাঁর নাম শান্তরক্ষিত। শান্তরক্ষিত পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য হিমালয়ের কোলে অবস্থিত দুর্গম তিব্বতে যাত্রা করেন।

এই শান্তরক্ষিতের তত্ত্বাবধানেই অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে তিব্বতের প্রথম বৌদ্ধ মঠ সাম্য বিহার স্থাপিত হয়েছিল। সাম্য বিহারে এসে অতীশ দেখলেন এখানে একটি অসাধারণ গ্রন্থাগার আছে, যেখানে হাজারেরও বেশি অমূল্য সব পুঁথি ও গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থের কোনো প্রতিলিপি ভারতবর্ষে নেই। অতীশ আর কালক্ষেপ না করে দ্রুত ওই গ্রন্থগুলির তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করে ফেলেন। ইতিমধ্যে তিনি তিব্বতীয় ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। এই বিপুল কাজ শেষ করতে তাঁর প্রায় চার বছর সময় লাগেছিলেন।

সাম্য বিহারের কার্য সমাধা করে অতীশ তিব্বতের লাসা প্রদেশের একটি ছোট্ট গ্রাম নিখানের একটি বৌদ্ধমঠে প্রায় চার বছর সময় অতিবাহিত করেন। জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে এই নিখানের শান্ত পরিবেশে অতীশ রচনা করলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা--- 'কালচক্র' অর্থাৎ সময়ের আবর্ত। এরপর ১০৫০ খ্রিস্টাব্দে ৭৩ বছর বয়েসে তিনি তাঁর শিষ্যদের অন্তিম ধর্মোপদেশ দেন। অসুস্থ শরীর ও দুর্গম পথ তাঁর পাল রাজা ও বিক্রমশীলা মহাবিহারস্থিত শ্রমণদের কাছে প্রত্যাবর্তনের প্রতিজ্ঞা পূরণের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে ৭৪ বছর বয়সে মাতৃভূমির কোমল শ্যামল পরিবেশ থেকে বহু দূরে তিব্বতের দুর্গম রুক্ষ্ম ভূমিতে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। তাঁর চিতা ভস্ম নিখান মঠে হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে সংরক্ষিত রয়েছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বহু রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়। বিদেশি দস্যুদের আক্রমণে ধ্বংস হয় শিক্ষার অন্যতম পীঠস্থান নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা। এরপর আসে ইংরেজ। ভুলিয়ে দেয় আমাদের গৌরবময় অতীত। ফলে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মতো মহামানবের কথা আমরা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হই। পরবর্তীকালে বাঙ্গালি গবেষক ও কূটনীতিক শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতে গেলে তিনি অতীশের সম্পর্কে জানতে পারেন এবং ফিরে এসে দেশবাসীকে জানান। এরও বহু পরে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে অতীশের অস্থিভস্ম বাংলাদেশের ঢাকার কাছে বাসাবোতে অবস্থিত ধান্মারাজিকা বৌদ্ধ মন্দিরে সংরক্ষিত করা হয়। ২০১৩ সালের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে বর্তমান বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জের বিক্রমপুরে বৌদ্ধ বিহার এবং ২০১৫ সালের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে বজ্রযোগিনী গ্রামে রাজকুমার চন্দ্রগর্ভ তথা অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মস্থানের খোঁজ মিলেছে।

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবন ঘটনাবহুল ও বৈচিত্র্যময়। এই বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা হলে ভারতের প্রাচীন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের অনেক অজানা দিক আমাদের সামনে উন্মোচিত হবে। □

গুপ্ত সমিতির খোঁজখবর

১৮৯০-১৯৩৪

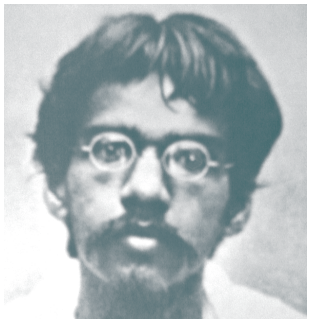

বারীন্দ্র কুমার ঘোষ

বাসুদেব চাপেকার

দামোদর চাপেকার

বালকৃষ্ণ চাপেকার

প্রমথনাথ মিত্র

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

১৮৯৭ সালের পর থেকেই বাঙ্গালিদের মধ্যে, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, সশস্ত্র লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। এরই ফলশ্রুতিতে বঙ্গদেশের কয়েকটি প্রান্তে জন্ম নেয় গুপ্ত সমিতি। এই সশস্ত্র লড়াই করে স্বাধীনতা লাভ এবং সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য গুপ্ত সমিতির আবির্ভাবের কয়েকটি যুক্তি ও স্তর আছে। সেইগুলির সঙ্গে পরিচিত হলে গুপ্ত সমিতির চলনটিকেও বোঝা সহজ হয়।

যে প্রধান তিনটি উপাদান সমাজব্যবস্থায় থাকলে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, আরও স্পষ্ট করে বললে, ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রথম উপাদান, বিপুল অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিনিধি এবং ভারতের নিজস্ব শিল্প বিকাশের ঘোরতর বিরোধী এক স্বেচ্ছাচারী, উৎপীড়ক বিদেশি সরকার। দ্বিতীয়, ভারতের ক্রমবর্ধমান ধনিক শ্রেণি। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অর্থনৈতিক সংকটজনিত কারণে ব্যাপক বিক্ষুব্ধ ভারতের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই তিনটি উপাদানের বিক্রিয়া। বিদেশি অপশাসন উৎখাত করতে জাতীয় বিদ্রোহের অগ্রদূতরূপে এগিয়ে আসে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। তারা সারা দেশে ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন মূলত কিছু সংবাদপত্রের মাধ্যমে।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী যখন অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত, তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং দ্রুত বিকাশ ঘটে গেছে, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে যারা, আপোশপন্থী মনোভাব নিয়ে চলেছেন। শ্রমিক শ্রেণী সংগঠিতভাবে উঠে দাঁড়াচ্ছে, কৃষক আন্দোলনেও এসেছে সংগ্রামী মনোভাব, জাতীয় আন্দোলনের কংগ্রেসি নেতৃত্ব তখনও লড়াই সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছেন ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর থেকে কিছু সুযোগ সুবিধা আদায়ের মধ্যে। কংগ্রেসের আপোশপন্থী পুরনো নেতৃত্ব যে সময় ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করবার জন্য কোনও জাতীয় আন্দোলন গড়বার চিন্তাও করতে পারছেন না, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী, যারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান শক্তি চরম আর্থিক দুর্দশায়, পরাধীনতার জ্বালায় অস্থির হয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আপোশ-বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ নেয়। এই দ্বন্দ্বই জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে চরমপন্থার জন্ম দেয়। এই চরমপন্থাকে দমিত করবার চেষ্টা করে ব্রিটিশ। প্রতিক্রিয়ায় দমিত চরমপন্থীরা তাদের অবরুদ্ধ ক্রোধ প্রকাশে সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মধারা শুরু করেন। যেহেতু তারা কোনও গণ-আন্দোলনের কথা সেই সময়ে ভাবেননি, শুরু হয় গোপন বিপ্লবী কর্মকাণ্ড। তাঁদের জ্বালানো এক-একটি স্ফুলিঙ্গ দেশজুড়ে বিদ্রোহের দাবানল সৃষ্টি করবে—সম্ভবত, এমন ধারণাই ছিল তাঁদের। এই গোপন বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবার জন্য গড়ে ওঠে গুপ্ত সমিতি।

২২ জুন ১৮৯৭ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'অগ্নিযুগ' অধ্যায়ের সূচনা। ওই তারিখে রাত্রিবেলায় দামোদর চাপেকর আর তাঁর ভাই বালকৃষ্ণ চাপেকর পুনার প্লেগ কমিশনার ওয়ালটার চার্লস র‍্যানড আর তার দেহরক্ষী লেফটেন্যান্ট চার্লস এগারটন আয়ার্স্ট-কে গুলি করে হত্যা করেন। প্লেগ রোগীদের পরীক্ষার নামে র‍্যানড আর আয়ার্স্ট নানান অত্যাচার করছিলেন। মহিলাদের লাঞ্ছনা করা হচ্ছিল।

পুনার ঘটনার পর মহারাষ্ট্রে সরকারি দমনপীড়ন তীব্র হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যকলাপ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন চরমপন্থীরা। নাসিকে গুপ্ত সমিতি

গড়ে ওঠে বিনায়ক দামোদর সাভারকর আর তাঁর ভাই গণেশ সাভারকরের উদ্যোগে। গোয়ালিয়র, আমেদাবাদ ও সাতারা-তেও গড়ে ওঠে গুপ্ত সমিতি। ২১ ডিসেম্বর ১৯০৯ নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর্থার ম্যাসন টিপ্পেটস্ জ্যাকসনকে হত্যা করা হয়। পুলিশ উন্মত্তের মতো হত্যাকারীর সহযোগীদের খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে। আটত্রিশজন গ্রেপ্তার হন। শুরু হয় বিখ্যাত নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা। নাসিক মামলার সূত্রেই পুলিশ গোয়ালিয়র রাজ্যেও একটি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির সন্ধান পায়। সন্ধান পাওয়া যায় সাতারার গুপ্ত সমিতির। শুরু হয় সাতারা ষড়যন্ত্র মামলা। পরপর তিনটি ষড়যন্ত্র এবং বহু নেতা, কর্মীর কারাদণ্ডের ফলে মহারাষ্ট্রের সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যকলাপ ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়ে। এরপর ১৯১১ সাল পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের কোথাও বিপ্লবী কাজের কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি। অপরপক্ষে এই সময়ে সারা ভারতে, বিশেষত বঙ্গদেশে সশস্ত্র বিপ্লবপন্থী কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে শুরু হয়।

বঙ্গপ্রদেশে সশস্ত্র বিপ্লবের বীজ আমদানি হয় মহারাষ্ট্র থেকে, বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে। অরবিন্দ ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বীজের বাহক। প্রথমে স্থাপিত হয় শরীরচর্চার আখড়া, পরে স্থায়ীভাবে গড়ে ওঠে গুপ্ত সমিতি। শরীরচর্চার ও মানসিক উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসাবে প্রথমে মধ্য কলকাতায় গড়ে ওঠে আত্মোন্নতি সমিতি, অব্যবহিত পরেই উত্তর কলকাতায় অনুশীলন সমিতি। পরবর্তীতে অনুশীলন সমিতি বিশাল আকার ধারণ করে। এই সমিতি থেকে সৃষ্টি হয় তিনটি বিরাট গুপ্ত সংগঠন—অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর সমিতি ও উত্তরবঙ্গ সমিতি। সমসময়ে অরবিন্দ ঘোষের বিপ্লবী আদর্শের অনুসারী তাঁর অগ্রজপ্রতিম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরোদারাজ সায়াজীরাও গায়কোয়াড়ের সেনাবিভাগের চাকরি ছেড়ে ১৯০১-এর শেষভাগে চলে এলেন কলকাতায়। ইতিপূর্বে এপ্রিল ১৯০১-এ অরবিন্দ কলকাতায় এসে বিবাহ করেছেন। অনুশীলন সমিতি স্থাপনার কিছু পরেই ১০৮/বি আপার সার্কুলার রোডে যতীন্দ্রনাথ স্থাপন করেন বঙ্গীয় বিপ্লবী সমিতি, যা এক গুপ্ত সংগঠন। এই বছরেই মেদিনীপুর শহরে রাজনারায়ণ বসুর ভাইপো জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু একটি গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলেন, যার প্রধান সহায়ক সত্যেন বসু ও হেমচন্দ্র দাস কানুনগো।

এমন একটা কথা বাজারে চালু আছে, যে ১৯০৫–৬ এর স্বদেশি আন্দোলনের সময় নাকি গুপ্ত সমিতির জন্ম। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। স্বদেশি আন্দোলনের অন্তত সাত বছর আগে গুপ্ত সমিতির জন্ম হয়েছে। ১৯০২ সালে জন্ম নিয়েছে একাধিক গুপ্ত সমিতি। এইসব সমিতির জন্ম স্বদেশ অনুরাগ-প্রবাহের কয়েকটি ঢেউ পার হয়ে এসে। যার সূচনায় আছে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যাশনাল পেপার। প্রতিষ্ঠার তারিখ ৭ আগস্ট ১৮৬৫। কাগজ পরিচালনার দায়িত্ব দেবেন্দ্রনাথ দিলেন নবগোপাল মিত্রকে। কাগজ চালানোর সঙ্গে পাড়ায়-পাড়ায় শরীরচর্চার প্রলচনকে উৎসাহ দিতে শুরু করলেন নবগোপাল। বিদেশি শিক্ষার কুফল প্রতিরোধ করে ভারতবাসীর মনে স্বাজাত্যবোধ আর স্বাবলম্বনবৃত্তির উন্মেষে তিনি চালু করলেন 'হিন্দু মেলা'। মেলা আর প্রদর্শনী–১২ এপ্রিল ১৮৬৭। এই মেলার সূত্র ধরেই বাঙ্গালির মনে গভীর জাতীয়তাবোধের অনুভব জন্মায়।

১৮৭৬ সালে রাজনারায়ণ বসু স্থাপন করলেন এক গুপ্ত সমিতি— সঞ্জীবনী সভা। তাঁর প্রধান সহযোগী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পড়ে জানা যায় এই সভা অনুষ্ঠানের খবর। বোঝা যায়, এ নামেই গুপ্ত সমিতি, গোপনীয়তার আঁচ অনুভব করছেন সবাই। তাদের কাজে রাজার বা প্রজার ভয়ের কোনও কারণ নেই।

১৯০২-এর কাছাকাছি সময়ে জানকীনাথ আর স্বর্ণকুমারী ঘোষালের কন্যা সরলা ঘোষাল অধ্যাপক মূর্তাজার সহযোগিতায় গঠন করলেন শরীরচর্চার সমিতি। আত্মবিশ্বাস জাগাবার জন্য ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও শিক্ষণ চলে সেখানে। সরলা দেবীর উদ্যোগে চালু হলো বেশ কয়েকটি জাতীয়তাবাদী উৎসব—শিবাজী উৎসব, প্রতাপাদিত্য উৎসব, উদয়াদিত্য উৎসব, বীরাষ্টমী ব্রত। অবশ্য সরলা দেবীর কেন্দ্র চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী হলেও কোনও গুপ্ত সমিতি নয়। এ সম্পূর্ণভাবে দেশাত্মবোধ জাগাবার কেন্দ্র। রাজা সুবোধ মল্লিকের কাকা হেমচন্দ্র বসু মল্লিকও ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। কিন্তু তা বেশিদিন চলেনি।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় আত্মোন্নতি সমিতি স্থাপিত হয় ১৮৯৭ সালে। এই সমিতি গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতৃত্ব দেন হরিশ্চন্দ্র শিকদার, নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সমিতির সূত্রপাত রঘুনাথের বাড়িতেই ১৩/বি ওয়েলিংটন স্কোয়ার (এখন রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার)। উনি থাকতেন খেলাতচন্দ্র ইনস্টিটিউশন স্কুলের পাশেই। প্রথমে কিন্তু আত্মোন্নতি সমিতি মোটেই বিপ্লবী সংগঠন ছিল না। তা ছিল, আলোচনা, বিতর্কসভার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের কেন্দ্র। শরীরচর্চার কেন্দ্র। এই পড়াশোনার কেন্দ্রটি পরবর্তীতে ক্রমশ বিপ্লবী সংগঠনে পরিণত হয়।

প্রথমদিকের সভ্য হিসেবে রঘুনাথ ছাড়া পাওয়া যায় নিবারণ ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র শিকদার, ভুবনেশ্বর সেন, রাধারমণ দাস প্রমুখ আঠারো-উনিশ জনের নাম। সমিতির সভ্যসংখ্যা বেড়ে গেলে তা সরিয়ে নেওয়া হয় খেলাৎচন্দ্র ইনস্টিটিউশনের স্কুল বাড়িতে ১৩ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ার। যেখানে স্কুলের সময়ের পর চলে পাঠচক্র, বিতর্কসভা, শরীরচর্চা। যোগ দেন ইন্দ্রনাথ নন্দী, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, প্রভাসচন্দ্র দে, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আট-ন জন তরুণ, যারা পরবর্তীতে সশস্ত্র বিপ্লবপন্থী হিসেবে পরিচিত।

চারটি স্তর পেরিয়ে আত্মোন্নতি সমিতি বিপ্লববাদী হয়ে উঠেছিল। ১৮৯৭ থেকে ১৮৯৯ হল প্রথম পর্যায়, যখন এই সমিতির কাজকর্ম পাঠচক্র, ঘরোয়া সভা, আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ। ১৮৯৯-১৯০১, এই পর্যায়ে শরীরচর্চা আর প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে এই সমিতি। তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ ১৯০১–১৯০২ সময়কালে ব্রিটিশরাজকে উৎখাত করতে সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী। ১৯০২ সালের পরে তারা অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেয়। অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিলেও কিছু কিছু চমকপ্রদ কাজকর্মের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে এই সমিতি। তাদের পরিচিতি ছিল আত্মোন্নতির বিপিনবিহারীর গ্রুপ হিসেবে। এই বিপিনবিহারীর (মধ্য কলকাতার আত্মোন্নতি সমিতি) দলই ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে বিদেশ থেকে আমদানি করা রডা কোম্পানির অস্ত্র অপহরণ করে বাঙ্গলার ন'টি গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির মধ্যে

বিলি করে দেয়। অস্ত্রগুলি ছিল মাউজার পিস্তল। এগুলি পিস্তল হিসাবে ব্যবহার করা যায়, আবার রাইফেল হিসাবেও। ব্রিটিশদের সিডিশন কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসের পর এমন বিপ্লবী ঘটনা খুব কমই ঘটেছে, যেখানে রডা কোম্পানির অপহৃত অস্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয়নি।

অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয় ২৪ মার্চ, ১৯০২। ঠিকানা উত্তর কলকাতার ২১ মদন মিত্র লেন। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসু। সতীশ প্রথমে গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের নারায়ণচন্দ্র বসাকের আখড়ায় ব্যায়াম করতেন। সেখান থেকে জেনারেল অ্যাসেম্বলি কলেজের (স্কটিশচার্চ কলেজ) জিমন্যাস্টিকস ক্লাবে ভর্তি হন। ক্রমশ নানান ঘটনায় তাঁর মনে হতে থাকে স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশি, জিমন্যাস্টিকস, লাঠিখেলা, বস্তিতে সেবামূলক কাজ করবার উপদেশ তারা ভুলে গেছেন। ভগিনী নিবেদিতাও তাকে স্বামীজীর এই উপদেশ স্মরণ করিয়ে দেন। স্বামীজীর ধর্ম বিষয়ে মতামত আলোচনার জন্য অধ্যাপক ওয়ানের অনুমতিক্রমে কলেজের আমতলায় আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু লাঠিখেলার অনুমতি পাওয়া যায়নি। এইজন্যই হেদুয়ার কাছেই মদন মিত্র লেনে লাঠিখেলার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা। নিউ ইন্ডিয়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে আখড়ার নামকরণ করবার অনুরোধ জানান সতীশচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য থেকে ধার করে নরেন্দ্রনাথ নাম দেন অনুশীলন সমিতি। সমিতির একজন সভাপতি দরকার। ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরীর চিঠি নিয়ে সতীশচন্দ্র ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি উচ্ছ্বসিত। কিছুদিন পরে এই প্রমথনাথই বরোদা থেকে আসা একটি দলের সঙ্গে অনুশীলনের সংযোগ ঘটিয়ে দেন। নতুন দল অর্থাৎ মিলিত অনুশীলন সমিতির সভাপতি প্রমথনাথ, সহ সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস ও অরবিন্দ ঘোষ; কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দলে এলেন আরও দুই ব্যারিস্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ হালদার। সভ্যদের ঘোড়ায় চড়া অভ্যাসের জন্য হালদার মশাই একটি ছোট ঘোড়া দলকে দান করেছিলেন। আপার সার্কুলার রোডে বরোদা থেকে আসা যতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসস্থানের পাশেই আর একটি আখড়া স্থাপন করা হয়। ঠিক হয় নতুন, কম বয়সি সভ্যরা শরীরচর্চা করবে মদন মিত্র লেনের আখড়ায়, আর পুরনো বয়স্ক সভ্যরা যাবে যতীনবাবুর বৈপ্লবিক সমিতির আপার সার্কুলার রোডের আখড়ায়।

পরবর্তীতে, ১৯০৫-৬ সালে প্রমথনাথ মিত্রের অনুপ্রেরণায় পূর্ববঙ্গের ঢাকায় অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। দায়িত্বে— পুলিন বিহারী দাস। পরিচালকের ভূমিকায় পি মিত্র। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা ইত্যাদি নানারকম শরীরচর্চা শুরু হয়। পুলিনবিহারী অতীব উদ্যোগী পুরুষ। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে অনুশীলন সমিতির শাখা। ১৯০৮ সালে যখন এই সমিতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, দেখা গেল পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত মিলিয়ে মোট ৬০০ টি শাখা রয়েছে অনুশীলনের। বিপ্লববাদ দমনে ব্রিটিশ সরকার যে রাওলাট কমিটি গঠন করেছিল, তার রিপোর্টেই পাওয়া যায় এই তথ্য।

সশস্ত্র বিপ্লবের পথ অনুসরণ করে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষায় বঙ্গদেশে প্রথম গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয় ১৯০২ সালে, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, পূর্ব কলকাতার গড়পারের উল্টোদিকে। বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতি। ঠিকানা ১০৮/বি আপার সার্কুলার রোড। সূচনাপর্ব থেকে সমিতির শিক্ষণের মধ্যে যেহেতু নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে শরীরচর্চা-লাঠিখেলা-ছোরাখেলা-ঘোড়ায় চড়া ইত্যাদির সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবের চর্চাও ছিল, অনুশীলন সমিতির সঙ্গে মিলন হলেও এই কর্মধারা তারা ত্যাগ করেনি। এইজন্যই, সমিতির ভেতরে অলিখিত দুটি দল হয়ে যায়। যাঁরা রাজনৈতিক প্রচারকর্মের ওপর বিশেষ জোর দিতেন, শরীরচর্চার সঙ্গে বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতির আদর্শের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। আত্মোন্নতি সমিতির সভ্যরা (যাদের সঙ্গেও সমিতির মিলন হয়েছিল) এদের সাহায্য করতেন। অন্যদলটি অনুশীলনের মদন মিত্র লেনের আখড়ায় লাঠিখেলা, কুস্তি, মুষ্ঠিযুদ্ধ নিয়েই মগ্ন থাকতেন। এতে হয়তো সুবিধাই হয়েছিল। অনুশীলনের লাঠিখেলা-ছোরাখেলার মতো প্রকাশ্য কর্মে পোক্ত হবার পর ছেলেটিকে বাজিয়ে দেখে বৈপ্লবিক সমিতির গোপন কর্মে লিপ্ত করবার সাংগঠনিক ব্যবস্থা তৈরি হয়ে যায়। এই দু-দলেরই সভাপতি ছিলেন প্রমথনাথ মিত্র (পি. মিত্র)।

১৯০৩ সালের গোড়ার দিকে অরবিন্দ ঘোষের নির্দেশে কলকাতায় চলে আসেন তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমার। যোগ দেন বৈপ্লবিক সমিতিতে। এর কিছু পরেই দলে আসেন অবিনাশ ভট্টাচার্য। এই সময়েই আত্মোন্নতি সমিতির ইন্দ্রনাথ নন্দী, রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন মুখোপাধ্যায় বৈপ্লবিক সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ক্রমে ওই সমিতির অন্যরাও বৈপ্লবিক সমিতির আখড়ায় যাওয়া-আসা করতে থাকেন। উপযুক্ত মনে হলে যতীন্দ্রনাথ তাকে কাজের ভার দিতেন। বিপ্লবী সমিতির সভ্যসংখ্যা বাড়তে থাকে। আত্মোন্নতি সমিতি মিশে যায় সমিতির সঙ্গে।

বিপ্লবী সমিতি চালাবার অর্থ দেবার কথা প্রমথনাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাস ও অরবিন্দ ঘোষের। বাস্তবিকপক্ষে, অরবিন্দের পাঠানো টাকাতেই সমিতি চলত।

আখড়ায় শরীরচর্চার মাঝে বিশ্বস্ত ছেলে বাছাই করে তাদের গ্যারিবল্ডির জীবনী, ম্যাজিনির আত্মজীবনী এবং অন্যান্য দেশের বৈপ্লবিক আনেদোলনের ইতিহাস ও পদ্ধতি বোঝান হতো। এই বিষয়টি বিপ্লবীদের খুবই প্রিয় ছিল। ম্যাজিনীর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে সংযোজিত 'গেরিলাযুদ্ধ' অধ্যায়টি টাইপ করে বিভিন্ন এলাকার বিপ্লবীদের পাঠান হত। এই যুদ্ধ-পদ্ধতিই বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতির লক্ষ্য ছিল। এই সময়ে 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইতালির বিপ্লব' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সমিতির পাঠচক্রে বক্তৃতা দিতেন প্রধানত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ মিত্র ও সখারাম গণেশ দেউস্কর। কিছুকাল পরে এই পাঠচক্র হতো প্রত্যেক শনিবার বিকেলে মন্মথ চ্যাটার্জির টাউন স্কুলে। অরবিন্দ ওই পাঠচক্রে বক্তৃতা দিয়েছেন।

বিপ্লবী সমিতির কাজকর্ম চালান হতো ইতালির কার্বোনারি এবং রাশিয়ার গুপ্ত সমিতির সংগঠন পদ্ধতির অনুসরণে। সমিতির প্রসারের জন্য প্রথমে বাঙ্গলার বিভিন্ন জায়গায় আখড়া স্থাপন করে স্থানীয় ছাত্রদের আহ্বান করা হতো যোগ দেবার জন্য। শরীরচর্চার সঙ্গে চলত দেশাত্মবোধক সংগীতের চর্চা। ক্রমশ ম্যাজিনির আত্মজীবনী, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের রচনাবলী, সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' পড়াবার ব্যবস্থা হতো। শিবাজী, প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম উৎসবের প্রাচলন করে মন খানিকটা তৈরি করে

নেওয়ার পর নির্বাচিত কিছু সভ্যকে গোপন সমিতিভুক্ত করা হতো।

১৯০৩-এর শেষভাগে বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের মনান্তর হয়। সার্কুলার রোডের আড্ডা ভেঙে যায়। যতীন্দ্রনাথ চলে যান ঝামাপুকুরের এক মেস-বাড়িতে। বারীন্দ্রকুমার, অবিনাশ ভট্টাচার্য মদন মিত্র লেনে। এই সময়েই দলে যোগ দেন স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। কিছুকাল পরে অরবিন্দ বরোদা থেকে এসে দু-দলের বিবাদ মিটিয়ে দেন। গ্রে স্ট্রিটে আস্তাবলের ওপর একটা বড়ো ঘরে আবার শুরু হয় সমিতির কাজ। অরবিন্দ কলকাতায় এলে ঝামাপুকুর লেনের মেসে ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। এই সময় থেকেই অরবিন্দ সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথের এক বিশেষ শ্রদ্ধা, প্রশংসার ভাব গড়ে ওঠে। উত্তরকালে তিনি অরবিন্দ সম্পর্কে লিখেছেন— 'অরবিন্দের প্রধান কর্ম ছিল স্তম্ভের ন্যায় নীরবে বসিয়া থাকা। লোকেরা তাঁহার আশেপাশে থাকিয়া কর্ম করিত। তিনি কেমিস্ট্রির ক্যাটালিটিক এজেন্ট-এর ন্যায় কর্ম করিতেন। আমরা এই জানিতাম, দেশের যে বক্তা যাহা বলুন না কেন তিনি যাহা বলিবেন, আমরা তাহা প্রাণ উপেক্ষা করিয়া সম্পন্ন করিব।' (নির্ণয় পত্রিকা, পৌষ-মাঘ ১৩৫৭, ভূপেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

গ্রে স্ট্রিটের বিপ্লবী সমিতির সদস্যরা তাদের কাজকর্মকে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায়, প্রতিবেশী বিহার-ওড়িশাতেও ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হলেন। এর পাশাপাশি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়ে গেছে। গ্রে স্ট্রিটের বিপ্লবী আড্ডা থেকে এই সময়ে প্রকাশিত হয় একটি ইংরেজি পুস্তিকা—নো কমপ্রোমাইজ। শোনা যায় এর লেখক অরবিন্দ ঘোষ। পুস্তিকাটি সারা বাঙ্গলায় প্রচারিত হয়। বাঙ্গলার বিপ্লবীদের প্রথম গোপন বেনামি প্রচার-পুস্তিকা এই 'নো কমপ্রোমাইজ'।

১৯০৪ সালের প্রথম ভাগে বিপ্লবী সমিতির গ্রে স্ট্রিটের আড্ডাও ভেঙে গেল। অরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার ফিরে যান বরোদায়। ওঁরা চলে গেলেও গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি কিন্তু উঠে যায়নি। দেবব্রত বসু (পরবর্তীতে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ), ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) প্রমুখ চেষ্টা করে গেছেন সমিতির কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার।

কলকাতা ছাড়বার আগে অরবিন্দ একটি গল্প প্রচার করেছিলেন— নর্মদাকুলের সাধুরা যোগবলে বুঝতে পেরেছেন যে রাজপুতনার কোনও সূর্যবংশীয় কুলে নাকি ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিনি এখন বালক। তাকে দলপতি মেনে ভারতব্যাপী একটি বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়েছে। মহারাষ্ট্র এদের বিশেষ ঘাঁটি। ১৯০৬ সালে দেশে বিপ্লব হবে কিন্তু 'কাপুরুষ বাঙালি' কিছু করছে না। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'গল্পের প্রথম ভাগটি আমরা হতভাগ্য নাস্তিক বাঙ্গালি যুবকের দল গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দিতাম, কিন্তু গল্পের শেষের ভাগটিই বাঙ্গলার ইতিহাসে বিশেষভাবে লীলা করে।.... 'কাপুরুষ বাঙ্গালি কিছু করিতে পারে না।' এই অপবাদ বাঙ্গালি যুবকের দল সহ্য করিতে রাজি হইল না। সকলেই আমরা বলাবলি করিতাম যে, ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের আম-দরবারে বাঙ্গলা যদি অন্তত হাজার কতক সৈন্য লইয়া হাজির না হয় তবে বাঙ্গলার মুখ থাকিবে কোথায়? ....'কাপুরুষ'—বাঙ্গালিকে এ অপবাদ স্খলন করিতে হইবে, ইহাই বাঙ্গালির বিশেষ ঝোঁক হইল। সেইজন্যই বাঙ্গলায় লাঠিখেলা, কুস্তি করা, বন্দুক ছোঁড়া ইত্যাদির আখড়া নানা স্থানে স্থাপিত হইতে লাগিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে রসায়ন বিদ্যাচর্চাও বিশেষভাবে হইতে লাগিল।'

১৯০৪ সালের মাঝামাঝি বাঙ্গালি যুবকদের মনে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছিল রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলাফল। যুবকরা উত্তেজিত। এশিয়ার এতটুকু দেশ জাপান, গর্বোদ্ধত ইউরোপীয় রুশদেশকে হারিয়ে দিয়েছে! জাপানের জয় যেন ভারতের বিপ্লবী তরুণদের জয়!

১৯০৪-এর দ্বিতীয়ার্ধে বারীন্দ্রকুমার আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। এবার এলেন অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে। এর মূল বিষয়, নির্জনে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা। একদল সন্ন্যাসী সেখানে পুজো চালাবেন। উদ্বৃত্ত অর্থ বিপ্লববাদ প্রচারে ব্যয় করা হবে। এই উদ্দেশ্যে 'ভবানী মন্দির' নামে একটি পুস্তিকাও লেখেন অরবিন্দ। ১৯০৫-এর মধ্যভাগে এই ইংরেজি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পরে তা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করা হয়েছিল। মন্দিরের জন্য চাঁদা তোলবার রসিদ বই ছাপানো হয়। মন্দির স্থাপনের জন্য ছোটনাগপুরের পাহাড়ে জমির খোঁজও করা হয়।

১৯০৫ সালের স্বদেশি আন্দোলনের অভিঘাতে বাঙ্গলার বৈপ্লবিক সমিতির কর্মপরিসর যেন হঠাৎ বহুগুণ বেড়ে গেল। বাঙ্গলার শহরে-মফস্সলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠতে থাকল নতুন-নতুন আখড়া, ব্যায়ামাগার, সমিতি। বৈপ্লবিক সমিতির সভ্যরা রাজনৈতিক প্রচারের দিকে ক্রমশ বেশি ঝুঁকে পড়লেন। এই সময়েই তাঁরা টাউন হলের সভায় বিলি করেন গোপন ইস্তাহার—'সোনার বাঙ্গলা'। জেলাতেও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এই জ্বালাময়ী ইস্তাহার।

বাঙ্গালির, বিশেষত বাঙ্গালি যুবার অহংবোধে তুমুল ধাক্কা দিয়েছিল বঙ্গভঙ্গ। বিশ্বের কত ছোটখাট দেশ শুধু দেশপ্রেমের জোরে কত বড়ো বড়ো শক্তিকে হারিয়ে দিচ্ছে, বাঙ্গালি পারবে না? বাঙ্গালির কোনও ধর্মবোধ নেই? দেশাত্মবোধ নেই? এই প্রশ্নের খোঁচায় বাঙ্গালি জেগে ওঠে। এর পরেই ১৯০৫ এর নভেম্বরে ঢাকায় স্থাপিত হয় অনুশীলন সমিতি।

বারীন্দ্রকুমার, ভূপেন্দ্রনাথ, অবিনাশচন্দ্র, দেবব্রত, উপেন্দ্রনাথ প্রমুখের মনে হয় বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের জন্য চাই একটি বিপ্লবী পত্রিকা। ভূপেন্দ্রনাথ বলছেন—'আমাদের উদ্দেশ্য ছিল একবার এই বাঙ্গলাকে তাহার চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া সত্য কথা বলিয়া যাইব। গুপ্তভাবে কথা চিরকাল চলিবে না। বৈপ্লবিক কার্য করিতেই হইবে ও সেই সঙ্গে কাগজও চালাইতেই হইবে।' এরই ফলশ্রুতিতে, 'রাজনৈতিক যুগান্তরের চিত্র' দেখানোর, 'বৈপ্লবিক মনোভাব' দেশের মধ্যে সঞ্চারিত করবার এবং সশস্ত্র সংঘর্ষের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতালাভের সংকল্প নিয়ে বিপ্লববাদীদের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'যুগান্তর' প্রকাশিত হয় ১৮ মার্চ ১৯০৬। মূল্য এক পয়সা। পত্রিকার কার্যালয় ২৭ কানাই ধর লেন, পরে যা স্থানান্তরিত হবে ৪১ চাঁপাতলা ফার্স্ট লেনে। ছাপাখানার নাম সাধনা প্রেস, কুমারটুলি।

এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা, তাদের বলা হত যুগান্তর গ্রুপের সদস্য। পরে এই যুগান্তর সমিতির নামে একাধিগ গুপ্ত সংগঠন গড়ে ওঠে সারা বাংলা জুড়ে।

পূর্ববঙ্গে ঢাকার অনুশীলন সমিতি ছাড়াও ছিল বাখরগঞ্জের স্বদেশ-বান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি ও ময়মনসিংহের

সুহৃদ সমিতি, সাধনা সমিতি এবং খুলনা-যশোরের যুগান্তর দল। বিপ্লবী সুধীরচন্দ্র দে'র নেতৃত্বে খুলনার 'যুগান্তর সমিতি' খুলনা ও যশোর জেলার প্রায় সব মহকুমায় এবং বহু গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে একটি বিশাল সংগঠনে পরিণত হয়। এই সময়ে বিভিন্ন জেলার বৈপ্লবিক সমিতিগুলি মিলিতভাবে বাঙ্গলা জুড়ে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন। এই সাধারণ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে খুলনার বিপ্লবীরাও তাঁদের জেলার জন্য একটি পরিকল্পনা করেন। ১৯১০ সালে ঢাকার অনুশীলন সমিতির সঙ্গে মিলে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কলকাতা থেকে যাতে কোনও ট্রেন না আসতে পারে সেজন্য বিপ্লবীদের একটি দল নাভারণ আর বেনাপোল রেলস্টেশনের মধ্যবর্তী রেললাইন উপড়ে ফেলবে। সঙ্গে-সঙ্গে বিপ্লবীদের আর একটি দল দখল করে নেবে খুলনার ট্রেজারি। পুলিশ লাইনের সমস্ত রাইফেল ও গোলা-গুলি অধিকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করবে—এই ছিল মূল পরিকল্পনা। একটি দলকে পাঠানো হয় কলকাতার জোড়াবাগানে। সেইখানে আত্মগোপন করে থেকে তাঁরা অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থসংগ্রহের কাজ করেন। অন্য দলটি খুলনা জেলার কয়েকটি জায়গায় ডাকাতি করে অর্থসংগ্রহের কাজ করতে থাকে। বিপ্লবীরা শেষ ডাকাতি করেন নাঙ্গলা গ্রামের এক ধনীগৃহে। সেইখানে দু-জনের অসাবধানতা বশত পুলিশ সকলের খোঁজ পায়। ক্রমশ সুধীরচন্দ্র দে-সহ এই বিদ্রোহের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে গ্রেপ্তার করে।

পূর্ববঙ্গের মাদারিপুরেও একটি স্বাধীন গুপ্ত সমিতির সন্ধান পাওয়া যায়। স্বাধীন মানে ওই অঞ্চলের দুই প্রধান দল অনুশীলন বা যুগান্তর সমিতির অধীনে না থেকে ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর শহরকে কেন্দ্র করে এলাকার যুবকদের উদ্যোগে গঠিত 'মাদারিপুর সমিতি'। স্বাধীন হলেও এদের কাজকর্ম অনুশীলন বা যুগান্তরের মতোই। এরাও রাজনৈতিক ডাকাতিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পরাধীন ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অপরিহার্য 'গেরিলা যুদ্ধ' হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই নীতি অনুসারে তারা ১৯১২ সালে বড়ো বড়ো তিনটি 'গেরিলা যুদ্ধ' করেন—জানুয়ারি মাসে বাইগুনতেয়ারীর ডাকাতি, ফেব্রুয়ারি মাসে আয়নাপুরের ডাকাতি আর নভেম্বর মাসে কোলার পোস্ট অফিস ডাকাতি। সব মিলিয়ে প্রায় এগারো হাজার টাকা সংগ্রহ হয়।

শ্রীহট্ট জেলার মৌলভিবাজার মহকুমায় স্বামী দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'অরুণাচল আশ্রম'টিও এক সময়ে বিপ্লবীদের গোপন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসাবে পুলিশের বিরাগভাজন হয়। এমনভাবেই বরিশালের শঙ্কর মঠকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে বিপ্লবীদের গোপন কর্মকাণ্ড।

বাঙ্গলার ফরাসি চন্দননগরেও ছিল গুপ্ত সমিতি। ১৯০৮ সালে চন্দননগরে একদল তরুণ 'সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়' নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। চারুচন্দ্র রায় ওই ক্লাবের সভাপতি। এখানে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, ড্রিল, কুচকাওয়াজ ইত্যাদি নানানরকমের শরীরচর্চা হতো। পরে এই ক্লাবের কাজকর্ম দুটি আঞ্চলিক নেতৃত্বে সংগঠিত হতে থাকে। শহরের উত্তরদিকে অর্থাৎ বড়াইচণ্ডীতলার দিকের নেতৃত্বে ছিলেন মতিলাল রায় আর দক্ষিণে গোঁদলপাড়ার দিকের দায়িত্বে ছিলেন বসন্তকুমার ব্যানার্জি। এই সময়েই এঁদের সঙ্গে যোগ দেন শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র দে'র মতো অসমসাহসী বিপ্লবী। ডালহৌসি স্কোয়ারে বোমা ছোঁড়া (মিঃ ডেনহ্যামকে হত্যার জন্য) এবং আলিপুর জেলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে হত্যার ব্যাপারে চন্দননগর দলের মতিলাল রায়, শ্রীচন্দ্র ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি পুলিশের সন্দেহভাজন হন। বিপ্লবী কানাইলাল দত্তও সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়ের সভ্য ছিলেন।

আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার এবং পরে প্রমাণাভাবে মুক্তি পেয়ে রাসবিহারী বসু দেরাদুনে চাকরি নিয়ে চলে যান। রাসবিহারী উত্তরভারতে গুপ্তসমিতি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। লাহোর ও দিল্লির ছাত্রদের মধ্যে প্রচার চলতে থাকে। ক্রমশ গুপ্ত সমিতির শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে। রাসবিহারী সমিতির সভ্যদের বোমা তৈরির পদ্ধতি, উপায় শেখাতেন। শিক্ষা দিতেন রিভলবার-বন্দুক ছোঁড়বারও। তাঁর সঙ্গে কলকাতার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন যুগান্তর দলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে বড়লাট হার্ডিঞ্জকে হত্যার উদ্দেশে বোমা ছোঁড়ে রাসবিহারীর দল। একজন নিহত ও বড়লাট গুরুতর আহত হন।

১ নভেম্বর ১৯১৩, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো থেকে 'গদর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার চালান হয়। এইভাবে হরদয়াল, রামচন্দ্র, পরমানন্দ, বরকতুল্লা প্রমুখ জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের তত্ত্বাবধানে মূলত প্রবাসী শিখদের নিয়ে গড়ে ওঠে গদর পার্টি নামে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন ইংরেজরা জার্মানির হাতে নাস্তানাবুদ হচ্ছে সেই সময় গদর পার্টি প্রবাসী শিখদের ভারতে ফেরবার এবং দেশের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করবার আহ্বান জানায়। গদর পার্টির নেতাদের অনেকেই দেশে ফিরে পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যকলাপ শুরু করেন।

মহারাষ্ট্র, বাঙ্গলা, পাঞ্জাব হয়ে এরপরে মাদ্রাজেও শুরু হয় গুপ্ত সমিতির তৎপরতা। চরমপন্থী নেতা চিদম্বরম পিল্লাই ও সুব্রহ্মণীয় শিব বিভিন্ন জেলায় গিয়ে যুব সমাজকে বৈপ্লবিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। 'স্বরাজ' নামের একটি তেলুগু এবং 'ভারত' নামের একটি তামিল পত্রিকার মাধ্যমে চরমপন্থী প্রচার চালান হতো। ১৯১১-র ১৭ জুন তিনেভেলি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসেকে গুলি করে হত্যা করা হয়। শুরু হয় তিনেভেলি ষড়যন্ত্র মামলা। এরপর মাদ্রাজে আর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিশেষ কিছু হয়নি।

১৯০৭–৮ সালে মধ্যপ্রদেশে চরমপন্থী প্রচেষ্টা শুরু হয়। মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীর বোমা বিস্ফোরণের অভিঘাত এখানেও পৌঁছেছিল। এই সময়েই নাগপুরের 'দেশসেবক' পত্রিকায় বোমার স্বপক্ষে নিবন্ধ ছাপা হয়—সব ভারতবাসীর উচিত বোমা তৈরি শিখে নেওয়া। মধ্যপ্রদেশের মতো ওড়িশা এবং বিহারেও সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন গড়ার চেষ্টা হয়েছিল। সংঘটিত হয়েছিল কয়েকটি ডাকাতি।

বিভিন্ন রাজ্যে গুপ্ত সমিতি এবং বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী সংগঠন গড়ে তোলবার চেষ্টা হলেও ব্রিটিশ দমন-পীড়নের চাপে এবং গণ-সমর্থন না পাবার কারণে অন্যান্য রাজ্যের গুপ্ত সমিতিগুলি দুর্বল হতে-হতে ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একমাত্র বাঙ্গলাতেই গুপ্ত সমিতিগুলি ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যকলাপ বজায় রাখতে পেরেছিল। □

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

এমএ ক্লাসের পরীক্ষা দিতে বসে এক সমস্যা হলো ছাত্রটির। সেদিন ছাত্রটির প্রিয় বিষয় দর্শনের পরীক্ষা। সব প্রশ্নের উত্তর জানা। কিন্তু প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতেই তিন ঘণ্টা সময় পার। বাড়ি ফিরে মন খারাপ। ভাবলেন বাকি পরীক্ষা আর দেবেন না। পরিবারের লোকেরা অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতে বাকি পরীক্ষাগুলি দিলেন। ফল বেরুতে দেখা গেল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপক-সহ সম্মানিত করেছে ছাত্রটিকে। এই মেধাবী ছাত্রটির নাম ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

শোনা যায়, ব্রজেন্দ্রনাথের সেই উত্তরপত্রে পরীক্ষকরা মন্তব্য করেছিলেন, ‘ ওই একটি উত্তরকেই মৌলিক গবেষণা হিসেবে গণ্য করা যায়।’ সেনেটে এই নিয়ে জরুরি সভা বসেছিল যে কী করা যায়। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা নম্বর পেয়েছেন বাকি প্রশ্নের উত্তরের জন্য তার শতাংশের হারে নম্বর ধরে দেওয়া হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে এমন সিদ্ধান্ত সেই প্রথম ও শেষ। তিনিই একমাত্র ছাত্র সে বছর দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ভাবা যায়!

একবার কলকাতা থেকে মুম্বাই যাচ্ছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড থম্পসন। হঠাৎ দেখেন এলাহাবাদ স্টেশনে তাঁর প্রথম শ্রেণীর কামরায় এক বাঙ্গালি ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। উঠেই

তিনি শুরু করলেন কমলালেবু খাওয়া। থম্পসন ভাবলেন বাঙ্গালিবাবু এবার গোটা কামরাটা না কমলালেবুর খোসায় নোংরা করে ফেলে। কিন্তু তেমন কিছুই হলো না। বাঙ্গালি ভদ্রলোকটি একটি প্যাকেটে ভরে রাখলেন কমলালেবুর খোসা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন থম্পসন। শুরু হলো আলাপ। প্রথমে ইতিহাস নিয়ে। কিন্তু খানিক পরেই দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, এমনকী ভূভারতে যত বিদ্যার শাখা আছে সবই উঠে আসতে লাগল তাঁদের আলোচনায়। ঠিক আলোচনা নয়, একতরফা বাঙ্গালিবাবুটিই বলে চলেছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড শুধুই শ্রোতা। তিনি মুগ্ধ হয়ে কেবল শুনছেন। মুম্বাই স্টেশনটা কেমন যেন তাড়াতাড়ি চলে এল। নামার সময় থম্পসন বললেন, ‘আপনার নাম জানতে চাইছি না। ভারতবর্ষে একজনই আছেন যাঁর প্রজ্ঞা এমন প্রসারিত। আমি নিশ্চিত , আপনিই সেই প্রখর জ্ঞানীপুরুষ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।’

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘ তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতলোক বহুশত বৎসর বঙ্গদেশে জন্মে নাই এবং শীঘ্রই যে জন্মিবে তাহাও আমার মনে হয় না।’ সুধীরচন্দ্র দত্ত বলেছিলেন, ‘ সক্রেটিস বংশের শেষ কুলপ্রদীপ।’ ‘চলন্ত বিশ্বকোষ’-এর মতো বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন বিনয় সরকার।

ব্রজেন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, ‘‘... সর্ববিদ্যা বিশারদ বলিয়া আখ্যা যদি কাহাকেও নিঃসংশয়ে দেওয়া যায়, তবে ব্রজেন্দ্রনাথ তাহার উপযুক্ততম পাত্র।’’ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ ৭২ বছর বয়সে পদার্পণ করিলে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘আচার্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সুহৃদবরেষু’ শীর্ষক এক প্রশস্তিবাণী প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এই প্রশস্তিবাণীতে লিখেছিলেন, ‘জ্ঞানের দুর্গম ঊর্ধ্বে উঠেছে, সমুচ্চ মহিমায়, যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমার সাধনা শিখরশ্রেণী...।’’ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড থম্পসনের বন্ধু প্যাট্রিক সাডেড বলেছেন,‘‘ শীল ওয়াজ দ্য গ্রেটেস্ট ব্রেন ফাংশনিং ইন দিস প্ল্যানেট।’’ ২৫ সেপ্টম্বর আচার্য শীলের জন্ম দিন। তাঁর মতো দিকপাল যাঁরা বাঙ্গালিকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়েছেন, তাঁদের আমাদের শ্রদ্ধা জানাতেই হবে।

(সংগৃহীত)

ভারতের বিপ্লবী

স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

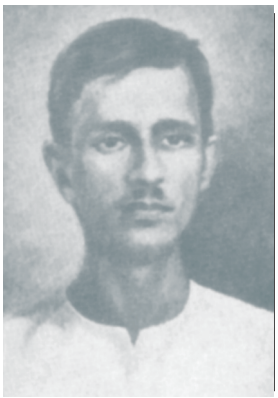

বিপ্লবী স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১০ সালের অক্টোবর মাসে হুগলী জেলার উত্তরপাড়ায়। উত্তরপাড়া ও কলকাতার ভবানীপুরের স্কুলে শিক্ষালাভ। ১৯২৭ সালে ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। উত্তরপাড়া কর্মীসঙ্ঘের সংগঠক এবং কর্মী হিসেবে জনসেবার কাজ শুরু। আরামবাগ ছাত্র আন্দোলন ও কৃষকদের খাজনা বন্ধের আন্দোলন পরিচালনা করার অপরাধে ১৯৩০ সালে কারারুদ্ধ হন। একবছর পরে মুক্তি পেয়ে গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কয়েক বছর পর তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। কিছুদিন পরে কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৪৫ সালে জাতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদে শান্তিমিছিল বের করলে ২ সেপ্টেম্বর ছুরিকাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

জানো কি?

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আসল পদবি ছিল কুশারী।
- বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে লেখাপড়ায় তাঁর হাতেখড়ি হয়।
- তিনি তাঁর বাবা-মায়ের চতুর্দশ সন্তান ছিলেন।।
- তাঁরা ১৫ ভাই-বোন ছিলেন।
- তাঁর স্ত্রীর নাম ভবতারিণী দেবী ছিল। পরে নাম হয় মৃণালিনী দেবী।
- তাঁর প্রথম কাব্যের নাম বনফুল।
- তাঁর প্রথম ছোটগল্প ভিখারিণী।

ভালো কথা

দাদুর বন্ধু

আমি কয়েকদিন থেকে দাদুর সঙ্গে সকালে পার্কে যাওয়া শুরু করেছি। দাদু কিছুক্ষণ হেঁটে পার্কের বেঞ্চিতে বসে প্রাণায়াম করেন। আমিও দাদুর পাশে বসে প্রাণায়াম করি। হঠাৎ দেখি একটি শালিকছানাকে একটা কাক তাড়া করেছে। ছানাটি চিৎকার করে উড়ে এসে নির্ভয়ে দাদুর কোলে বসল। দাদু কাকটিকে তাড়িয়ে দিলেন। আমি দাদুকে বললাম তোমাকে ছানাটি ভয় করল না কেন? দাদু বলেন এই পার্কের সব পাখিই আমার বন্ধু। একদিন একটি ছোটো পাখিকে একটি বাজপাখি ধরেছিল। পাখিটি প্রাণভয়ে চিৎকার করছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে বাজটিকে তাড়িয়ে দিই। তখন থেকে ওরা আমার বন্ধু হয়ে গেছে। ভালোবাসলে সবাই বন্ধু হয়।

পূর্ণিমা চক্রবর্তী, একাদশ শ্রেণী, রাণাঘাট, নদীয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ল অ কা ক্ক	(১) রি প য় অ র ক্ষ চ
(২) শ জা ক্র অ	(২) ন হী ন জ্ঞা র ক্ষ অ

২৪ অক্টোবর সংখ্যার উত্তর

(১) গালিগালাজ (২) গুরুদক্ষিণা

২৪ অক্টোবর সংখ্যার উত্তর

(১) কালিকাপুরাণ (২) কুসুমমালিকা

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভজিৎ দাঁ, টিপি রোড, কলকাতা-৬ (২) অভিজিৎ দাঁ, ১৯ কেষ্টদাস পাল লেন, কল-৬। (৩) রাকেশ মণ্ডল, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর। (৪) শুভম হালদার, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

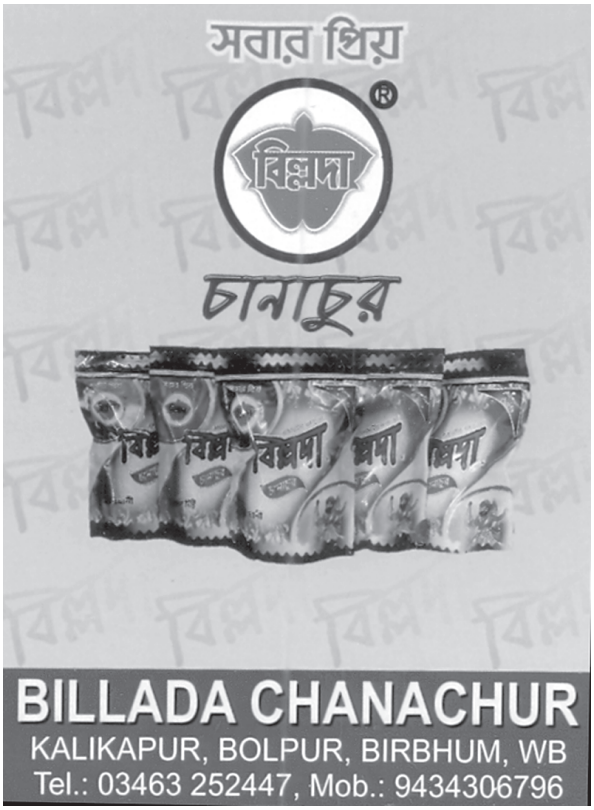

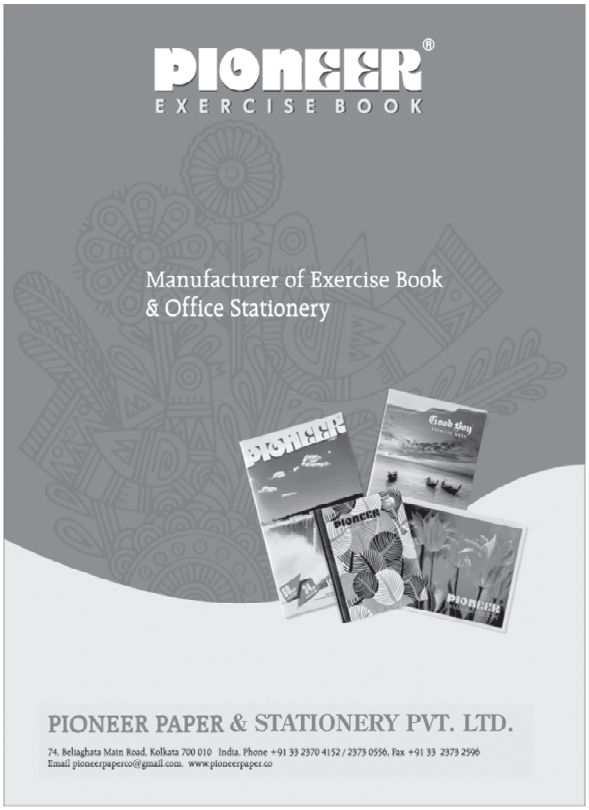

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

অনুচ্চারিত ইতিহাসের রসহ্যভেদ

দেবযানী ভট্টাচার্য্য

সম্প্রতি শুরু হয়েছে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নেওয়া বেশ কিছু সিদ্ধান্তের চুলচেরা বিশ্লেষণ। যেমন, ১৯৫০ সালে এবং ১৯৫৫ সালে ভারতের কাছে না-চাইতেই আসা রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার প্রস্তাবের নেহরু কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত।

ইউএনএসসি'র স্থায়ী সদস্য হওয়ার প্রস্তাব ভারতের কাছে প্রথম এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার বছর পাঁচেকের মধ্যেই। কিন্তু সে প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রথম চার স্থায়ী সদস্য তখন আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স। পাঁচ নম্বরে ছিল তাইওয়ান। ১৯৪৯-এ চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বাধীন চীনা ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেন্টের তখন সদ্য পতন হয়েছে। চিয়াং কাইশেক পলায়নান্তে আশ্রয় নিয়েছেন তাইওয়ানে, চীনের শাসনভার গিয়েছে কমিউনিস্ট নেতা মাও সে তুং-এর হাতে, পিপলস রিপাবলিক অব চায়না। এইরকম এক সময়ে আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে ভারতের রাষ্ট্রদূত তখন জওহরলাল নেহরুর বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। ১৯৫০ সালে আগস্ট মাসের শেষের দিকে নেহরুকে তিনি লিখলেন— 'One matter that is being cooked up in the State Department should be known to you. This is the unseating of China as a Permanent Member in the Security Council and of India being put in her place.' অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সেই সময়ে পৃথিবী যখন সাক্ষী থাকছে আমেরিকা বনাম সোভিয়েত ইউনিয়ন কোল্ড

Chinese attack on both fronts

Forward posts fall in NEFA, Ladakh after stiff fight

NO MILITARY PLANES IN OPERATION: MENON

Express News Service

NEW DELHI Oct. 20

THE Indian posts of Dhola and Khinzemane, along the MacMahon Line, in the NEFA sector and two posts in the Chip Chap river valley area of the Ladakh western sector fell to the Chinese on Friday when they simultaneously launched a big offensive against the Indian forces

Moscow silent

"PUSH BACK CHINA"

Relations with China: official view in Delhi

Reference to U N not yet, says Menon

Mystery over

ওয়ারের, তখন কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি আর একটি কমিউনিস্ট দেশকে (পিপলস রিপাবলিক অব চায়না) রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদে বহাল রাখায় আপত্তি ছিল আমেরিকার। যদিও চীনের ন্যাশনালিস্ট লিডার চিয়াং কাইশেকের পতনের আগে চীন তথা তাইওয়ান রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ছিল, কিন্তু সেদেশে তখন ছিল ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেন্ট। সরকার পরিবর্তিত হয়ে চীনে কমিউনিস্ট পার্টির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের

স্থায়ী সদস্যপদ থেকে চীনকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ আমেরিকা নিয়ে ফেলে এবং চীনকে সরাতে ব্যবহার করতে চায় ভারতকে।

বাদ সাধলেন নেহরু। বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের চিঠির জবাবে নেহরু অবিলম্বে তাঁকে লিখলেন— ''In your letter you mention that the State Department is trying to unseat China as a Permanent Member of the Security Council and to put India in her place. So far as we are concerned, we are not going to countenance it. That would be bad from every point of view. It would be a clear affront to China and it would mean some kind of a break between us and China. We shall go on pressing for China's admission in the UN and the Security Concil. I suppose that a crisis will come during the next session of the General Assembly of the UN on this issue. The people's government of China is sending a full delegation there. If they fail to get in there will be trouble which might even result in the USSR and some other countries finally quitting the UN. That may please the State Department, but it would mean the end of the UN as we have known it. That would also mean a further drift towards war. India because of many factors, is certainly entitled to a permanent seat in the security council. But we are not going in at the cost of China." অর্থাৎ চীনের স্বার্থের বিনিময়ে ভারত তার স্বার্থরক্ষা করবে না। চীনের সঙ্গে সদ্ভাব নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। 'That would be bad from every point of view.' এরকম নেহরু কেন লিখেছিলেন, কোন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে চীনের বদলে ভারতের অন্তর্ভুক্তি হলে মন্দ হতো বলে ভেবেছিলেন তিনি, কেন বলেছিলেন 'We shall go on pressing for China's admission in the UN and the Security Council.' —এসব প্রশ্নের সদুত্তর খোঁজা প্রয়োজন। অতি সাম্প্রতিককালের আগে পর্যন্ত ১৯৫০ সালে আমেরিকার তরফ থেকে ভারতকে দেওয়া এহেন প্রস্তাব এবং নেহরু কর্তৃক সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি পাবলিক ডোমেইনে তেমন বহু আলোচিত ছিল না যদিও আমেরিকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার এহেন সিদ্ধান্তকে ১৯৫১ সালে লক্ষ্ণৌতে উপহাস করেছিলেন বাবাসাহেব আম্বেদকর। 'The government's foreign policy failed to make India stronger. Why should not India get a permanent seat in the UN Security Coundil? Why has prime minister not tried for it?' প্রশ্ন তোলেন বাবাসাহেব।

২০১৫ সালে ঐতিহাসিক অ্যান্টন হার্ডার এক রিপোর্টে ব্যক্ত করেন যে '১৯৫০ সালেই রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ গ্রহণ করার জন্য ভারতের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখে আমেরিকা এবং সেই প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য ভারতের ওপর চাপও বাড়াতে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র'। স্পষ্টতই, কোল্ডওয়ার রেজিমে ইউএনএসসিতে কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি কমিউনিস্ট চীনেরও ভেটো পাওয়ার থাক এমনটি চায়নি আমেরিকা। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এহেন মার্কিনি চাহিদা রাজনৈতিকভাবে অপ্রত্যাশিত বা বেমানান ছিল না। ভারত এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু নেহরু লেখেন— '...we are not going in at the cost of China.' ২০০৪ সালে কংগ্রেস নেতা শশী থারুরও এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে ১৯৫৩'তেও ইউএনএসসি'র স্থায়ী সদস্যপদ ভারতকে দিতে চায় আমেরিকা, কিন্তু নেহরু তা গ্রহণ করতে রাজি হন না এবং প্রস্তাব রাখেন যে সে পদ ভারতের পরিবর্তে চীনকে দেওয়া হোক। তথ্য অনুযায়ী, নেহরু বলেছিলেন রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ তাইওয়ানের রয়েছে, কিন্তু ওই সদস্যপদে থাকার যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যতা তাইওয়ানের নেই। তাই ওই সদস্যপদ বরং বেইজিংকে দেওয়া হোক। চীনের পূর্ববর্তী ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেন্টের প্রতি কোনো আস্থা নেহরুর ছিল না, কিন্তু চৈনিক রাজনীতির পট পরিবর্তনের পর মাও সে তুঙের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট ভাবধারার পিপলস রিপাবলিক অব চায়নাকে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ স্বীকৃতি পাইয়ে দেওয়ার জন্য ক্রমাগত তদ্বির করেছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। এর জন্য অবশ্য অনেকেই বলেছেন যে নেহরু নিজেও ছিলেন মনেপ্রাণে একজন কমিউনিস্ট এবং সেই কারণেই মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন কমিউনিস্ট চীনের অন্তর্ভুক্তির জন্য। তবে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে মনে হতে পারে যে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রতি নেহরুর স্বভাবগত দুর্বলতার কারণেই হয়তো ক্যাপিটালিস্ট আমেরিকার প্রস্তাবে রাজি হতে পারেননি তিনি। বরং আমেরিকার প্রস্তাবকে চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খারাপ করার উদ্দেশ্যে ভারতের জন্য একটি 'মার্কিনি টোপ' হিসেবেও বর্ণনা করেছিলেন নেহরু। অর্থাৎ মনে হতে পারে যে আমেরিকা না হয়ে প্রস্তাবটি সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে এলে নেহরু হয়তো তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। কিন্তু বাস্তবের অভিঘাত ছিল অন্যরকম।

নেহরু যে কেবলমাত্র আমেরিকার প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তা নয়, প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাবও। ইউএনএসসি'র স্থায়ী সদস্য হওয়ার প্রস্তাব ভারতের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে আসে ১৯৫৫ সালে। এই বছর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা, উভয় দেশের কাছ থেকেই ভারতের কাছে আসে এই প্রস্তাব। ১৯৫৫ সালের ২১ জুন মস্কোতে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী নিকোলাই বুলগানিন নেহরুর কাছে প্রস্তাব রাখেন যে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের অন্তর্ভুক্তি হতে পারে ষষ্ঠ সদস্য হিসেবে। আমেরিকার প্রস্তাবে ছিল চীন তথা তাইওয়ানের পরিবর্তে ইউএনএসসিতে ভারতের অন্তর্ভুক্তির অবতারণা। কিন্তু ইউএনএসসিতে চীনকে প্রতিস্থাপন করায় তাঁর আপত্তির কথা নেহরু যেহেতু আমেরিকাকে ১৯৫০ সালেই

মাও সে তুঙের সঙ্গে নেহরু

জানিয়েছিলেন, সেই কারণেই হয়তো চীনকে ইউএনএসসিতে স্থায়ী সদস্য হিসেবে রেখেও ষষ্ঠ সদস্য হিসেবে ভারতের অন্তর্ভুক্তির কথা বলেন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন। তার জন্য ইউএন চার্টারে যে পরিবর্তন আনা যেতে পারে, সে প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়। কিন্তু সেই প্রস্তাবও নেহরুর কাছে গ্রহণীয় মনে হয়নি। নেহরু বিশেষজ্ঞদের মতে এই অফারটিও নাকি সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে ভারতকে 'বাজিয়ে দেখা' ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তথ্য অনুযায়ী, বুলগানিনের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে নেহরু বলেছিলেন— 'We feel that this should not be done till the question of China's admission and possibly of others is first solved. I feel that we should first concentrate on getting China admitted.' নেহরুকে দেখা গিয়েছিল চীনঅন্ত প্রাণ। কিন্তু কেন এমন প্রাণান্তকর রকম চীনঅন্তপ্রাণ হয়েছিলেন নেহরু, তার আদত কারণ অনুসন্ধান করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে যে পাক্ষিক পত্র নেহরু লিখতেন, ১৯৫৫ সালের ২ আগস্টের সেই পত্রে তিনি লেখেন— 'Informally, suggestions have been made by the United States that China should be taken into the United Nations but not in the Security Council and that India should take her place in the Security Council. We cannot of course accept this as it means falling out with China and it would be very unfair for a great country like China not to be in the Security Council. We have, therefore, made it clear to those who suggested this that we cannot agree to this suggestion. We have even gone a little further and said that India is not anxious to enter the Security Council at this stage, even though as a great country she ought to be there. The first step to be taken is for China to take her rightful place and then the question of India might be considered separately.' অর্থাৎ আগে চীন, পরে ভারত। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী এমন 'চীন-চীন' করছিলেন কেন? রাষ্ট্রপুঞ্জে কমিউনিস্ট চীনের পায়ের তলার জমি শক্ত করতে এমন ধারাবাহিক প্রয়াসের পিছনে নেহরুর যুক্তি কী ছিল তা না জানলে এ প্রশ্নর আদত উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু সেই পর্যন্ত যাওয়ার আগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৫০ সাল থেকে শুরু করে, ১৯৫৫ পর্যন্ত নেহরু যে বারংবার আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে গিয়েছেন, সে বিষয়ে ভারতীয় সংসদকে তিনি রেখেছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তটি ভারতীয় সংসদের সিদ্ধান্ত ছিল না, ছিল জওহরলাল নেহরুর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে ভারত রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত করে তোলার এই ঔদ্ধত্যকে অনেকেই ক্রুদ্ধ হয়ে বর্ণনা করেছেন 'তঞ্চকতা' হিসেবে। নেহরুর সেই মানসিকতার মধ্যে তঞ্চকতা সত্যই ছিল কিনা তা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে যখন ১৯৫৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ড. জে এন পারেখ এই প্রসঙ্গে ভারতের সংসদে তোলেন একটি শর্ট নোটিশ প্রশ্ন। ভারত কি সত্যই রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ গ্রহণের একটি ইনফরমাল প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে? জিজ্ঞেস করেন ড. জে এন পারেখ। উত্তরে সরাসরি মিথ্যাভাষণ করেন জওহরলাল নেহরু। 'There has been no offer, formal or informal, of this kind. Some vague references have appeared in the press about it which have not foundation in fact.

The composition of the Security Council is prescribed by the UN Charter, accoording to which certain specified nations have permanent seats. No change or addition can be made to this without an amendment of the Charter. There is, therefore, no question of a seat being offered and India declining it. Our decleared policy is to support the admission of all nations qualified for UN membership.' এমন মিথ্যাভাষণ সন্দেহ উদ্রেককারী। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ গ্রহণের প্রস্তাব বারংবার কেন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তার যৌক্তিক উপস্থাপনা থেকে ভারতের সংসদকে বঞ্চিত রেখে কেন মিথ্যাভাষণের আশ্রয় নিয়েছিলেন নেহরু তা আজও রহস্য। চীনের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করতে পারলে ভারতবর্ষের অথবা জওহরলাল নেহরুর ব্যক্তিগত লাভ কী হতে পারত তার কোনো স্পষ্ট সদুত্তর ইতিহাস আজও দেয় না। উপরন্তু এই সংক্রান্ত বিষয়ে নেহরু বিরোধী সমালোচনা যখন সাম্প্রতিক অতীতে দেশজুড়ে ক্রমশ গতি বৃদ্ধি করেছে, তখন নেহরুর আমলের এক ভারতীয় আমলা কে শঙ্কর বাজপেয়ী ২০১৯ সালের মার্চ মাসে সংবাদমাধ্যমকে বলেন— 'নেহরুর সমালোচনা করা হাল আমলের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ১৯৫০-৫৫'য় চীনের বিপরীতে ভারতের পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব ছিল বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা মূর্খ'। একথা যদি সত্যিও হয়ে থাকে, তাহলেও কেবলমাত্র ইউএনএসসির সদস্যপদ প্রত্যাখ্যান করেই নেহরু নিবৃত্ত হতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি হননি, বরং চীনের সদস্যপদের জন্য ব্যক্তিগতভাবে নিরলস তদ্বির করেছিলেন পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলির কাছে। এ কাজ নেহরুকে করতে হয়েছিল কোন যুক্তিতে সে বিষয়ে ধারণা করতে হলে এযাবৎপ্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই।

জওহরলাল নেহরুর নির্মম সমালোচনা করেছিলেন অরুণ শৌরিও। '...is the first to ensure that India recognizes the new Govenment (of China). He also urges countries like UK to hasten recognition. Although, it is Chiang Kaishek who has supported India's struggle for independence... Nehru immediately begins championing the cause of the new Government of China. He urges the British, the Americans, in fact everyone he can reach, that the Nationalist Govenment of Chiang Kaishek must be made to vacate its seat in the United Nations, and that seat---which means necessarily the seat both in the General Assembly and the Security Council---must be given over to the Communist Govenment of China...' অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিল চীনের যে জাতীয়তাবাদী সরকার, তার প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন চিয়াং কাইশেক। কিন্তু চিয়াং কাইশেকের পতনের পর রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে চিয়াং কাইশেকের অপসারণের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস শুরু করেছিলেন নেহরু। শুরু করেছিলেন ব্রিটেন, আমেরিকা ইত্যাদি দেশগুলির কাছে কাইশেক-বিরোধী অ্যাগ্রেসিভ লবিং যাতে যে কোনো ভাবে কাইশেককে সরে যেতে বাধ্য করা হয় এবং বৈশ্বিক স্বীকৃতি লাভ করতে পারে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন নতুন চীন সরকার। চিয়াং কাইশেকের পতন এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির উত্থানের এই সময়ে অবৈধভাবে তিব্বত দখল করেছিল চীন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চীনের হয়ে এমনভাবেই লবিং করেন নেহরু যাতে অবৈধ তিব্বত দখলের কারণেও ইউএনএসসিতে চীনের স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার বিষয়টিতে কোনো দেশ আপত্তি না তোলে। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী চীনের কমিউনিস্ট চীনে রূপান্তর যাতে মসৃণভাবে বৈশ্বিক স্বীকৃতি পায় এবং রাষ্ট্রপুঞ্জে একই রকম শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে (যেমনটা ছিল চিয়াং কাইশেকের সময়ে), তার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। খুবই আশ্চর্যজনক এবং এ হেন আচরণ নেহরুর সুযোগসন্ধানী ও অকৃতজ্ঞ মানসিকতার নির্দেশক। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নৈতিকভাবে সমর্থন করেছিল চীনের যে ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেন্ট, সেই সরকারের বিরুদ্ধে অ্যাগ্রেসিভ লবিং করার মানসিকতাকে নৈতিক দেউলিয়াপনা বললে ভুল হয় না যদিও ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে এমন কঠোর নেতিবাচক ভাবনা আত্মসম্মানার্থেই ভারতবাসীর জন্য বিড়ম্বনাকর। কিন্তু এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যই যেহেতু নেহরুর চীনঅন্তপ্রাণ হওয়ার কারণ অনুসন্ধান, ফলে সত্যানুসন্ধানের স্বার্থেই নির্মোহ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে হবে। তবে চীনের প্রতিষ্ঠাহেতু নেহরুর এহেন তদ্বির মাও সে তুং কিন্তু ভালোভাবে নেননি, কারণ কমিউনিস্ট চীন একদম প্রথম থেকেই ভারতকে গুরুত্ব দিতে চায়নি। তারা ভাবতে চেয়েছিল যে এশিয়া মহাদেশের প্রকৃত প্রতিনিধি তারাই, ভারত নয়। তাই রাষ্ট্রপুঞ্জে তাদের বৈশ্বিক স্বীকৃতি যদি ভারতের উদ্যোগে আসে তবে চীনের রাজনৈতিক মর্যাদার পক্ষে তা হানিকর নিশ্চয়ই। উপরন্তু তিব্বত বা কোরিয়ার ওপর সামরিকভাবে আগ্রাসী হয়ে উঠতে চাওয়া চীন যে কেবলমাত্র ইউএন চার্টারের নিয়মাবলীর কারণে সংযত থাকবে না নেহরু তা হয় আন্দাজ করতে পারেননি অথবা আন্দাজ করলেও তার দ্বারা চীনের হয়ে লবিং করা থেকে নিবৃত্ত হননি। ঐতিহাসিক অ্যান্টন হার্ডার লিখেছেন— 'integrating PRC into the international community by conceding to China's right to the seat' was in fact the 'central pillar of Nehru's foreign policy.' অর্থাৎ ভারতের স্বার্থ ত্যাগ করে চীনের জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া ছিল নেহরুর বিদেশনীতির মূল স্তম্ভ। চীনের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে যে কোনো মূল্যে উদগ্রীব ছিলেন নেহরু, পরিবর্তে মাও'-এর চীন কিন্তু ভারতের সঙ্গে অনুরূপ সদ্ভাব বজায় রাখতে কোনো আগ্রহই দেখায়নি। মূল প্রশ্ন হলো— এই প্রকার একতরফা আকুলতার প্রকৃত কারণ তাহলে কী ছিল? *(ক্রমশ)*

সোনার সুযোগ হেলায় হারিয়েছিলেন নেহরু

নেহরু জীবনে অনেক ভুল করেছেন। তবে সব থেকে বড়ো ভুল যে বালুচিস্তান নিয়ে করেছিলেন আজ আর সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দিব্যেন্দু বটব্যাল

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর দুটি ভুল সিদ্ধান্তের মাশুল আজও আমাদের গুনতে হচ্ছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনী দ্য প্রেসিডেন্সিয়াল ইয়ার্সে লিখেছেন, নেপালের রাজা ত্রিভুবন বীরবিক্রম শাহ নেপালকে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য করার অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু নেহরু পত্রপাঠ সেই প্রস্তাব বাতিল করে দেন। গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে (My Prime Ministers : Different Styles, Different Temperamnts) প্রণবাবু লিখেছেন, 'প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রীর কাজ করার ধরন আলাদা। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কাজ করার স্টাইল নেহরুর থেকে ভিন্ন গোত্রের। একই দল ও মতাদর্শের মানুষ হলেও বিদেশনীতি, সামরিক নীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রগুলিতে তাদের দৃষ্টিকোণও ছিল আলাদা।' নেপালের প্রস্তাব এবং নেহরুর প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি খোলসা করে প্রণববাবু লিখেছেন, 'নেপালে রাণাদের শাসনের অবলুপ্তি ঘটিয়ে রাজতন্ত্রের শাসন চালু হলো। নেপালের রাজা চাইতেন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। এই পরিপ্রেক্ষিতেই রাজা ত্রিভুবন বীরবিক্রম শাহ গণতান্ত্রিক ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে নেপালকে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেপাল একটি স্বাধীন দেশ এবং কোনও অবস্থাতেই নেপালের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়, এই যুক্তিতে নেহরু নেপালের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে নেহরুর এই সিদ্ধান্ত কি ভুল ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর প্রণববাবু একটু ঘুরিয়ে দিয়েছেন। লিখেছেন, 'নেহরুর জায়গায় ইন্দিরা গান্ধী থাকলে সুযোগটা হাতছাড়া করতেন না, ঠিক যেমন সিকিমের ক্ষেত্রে করেননি।' অর্থাৎ তিনি কার্যত মেনে নিয়েছেন নেহরু ভুল করেছেন। আজকের পরিবর্তিত ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও মনে হয় নেহরু সেদিন ভুলই করেছিলেন। কারণ নেপাল যদি ভারতের অঙ্গরাজ্য হতো তাহলে চীনের বিরুদ্ধে সামরিক দিক থেকে ভারত অনেকটাই সুবিধাজনক জায়গায় থাকত। নেপালকে ব্যবহার করে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারত না চীন। বস্তুত চীন যে ভবিষ্যতে মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে সেটা নেহরু বুঝতেই পারেননি। অথবা বলা ভালো, বুঝতে চাননি। এর জন্য নেহরুর সাংঘাতিক চীনপ্রীতিই দায়ী। সমাজতন্ত্রের প্রতি নেহরুর ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ। তিনি নিজে রোম্যান্টিক ঘরানার মানুষ। কমিউনিজমের প্রচ্ছন্ন রোম্যান্স তাকে আকর্ষণ করে থাকবে। এই আকর্ষণ কতটা তীব্র হতে পারে তার প্রমাণ আমরা পাই ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধে। সেই

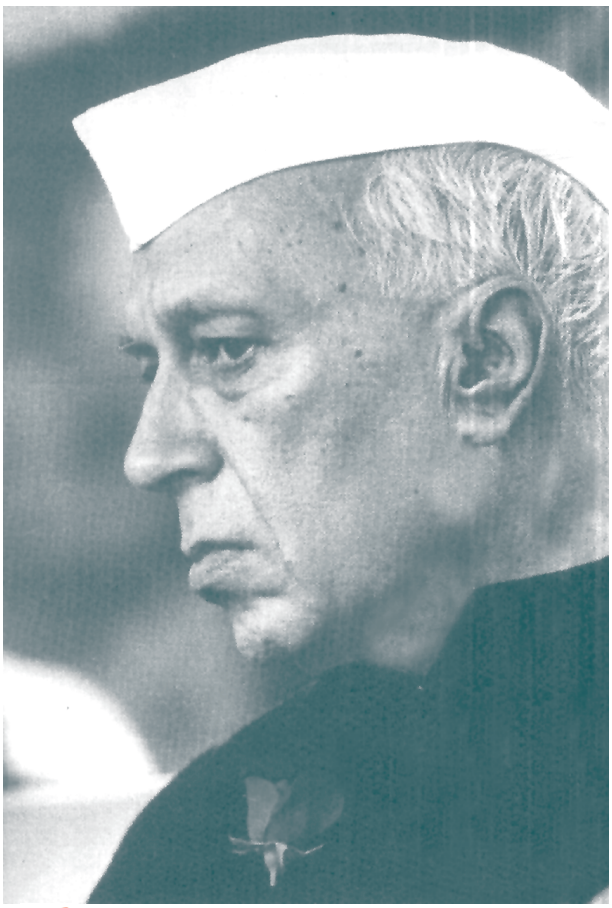

"নেহরুর বিদেশনীতি আমার কাছে যে শুধু বিরক্তিকর তাই নয়, একইসঙ্গে যথেষ্ট উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তার কারণ।"

— ড. আম্বেদকর

সময়কার অনেক সেনানায়ক পরবর্তীকালে কবুল করেছেন, নেহরু যদি সময়মতো বায়ুসেনাকে ব্যবহার করতেন তাহলে যুদ্ধের ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। সে পরামর্শও তাঁরা দিয়েছিলেন কিন্তু নেহরু রাজি হননি। এই অনীহা কার স্বার্থে সেটা গবেষকরা বলবেন। কেউ কেউ মনে করেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ঠাণ্ডা যুদ্ধের আবহে সারা বিশ্বে শান্তির দূত হবার তীব্র মোহ নেহরুকে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে দেয়নি।

নেপালের পর বালুচিস্তান। নেহরুর বালুচিস্তান নীতিও ভুল। অন্তত আজকের পরিবর্তিত ভারত-পাকিস্তান পরিস্থিতির বিচারে। এক্ষেত্রেও নেহরু বালুচিস্তানের সামরিক গুরুত্ব বুঝতে ভুল করেছিলেন এবং কালাতের রাজা (খান অব কালাত) আহমেদিয়ার খানের বালুচিস্তানকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছিলেন। পরে পাকিস্তান বালুচিস্তান দখল করে। এখন পাকিস্তানের মোট ভূখণ্ডের ৪০ শতাংশ বালুচিস্তানের। তার থেকেও বড়ো কথা বালুচিস্তানের গোয়াদর বন্দর ব্যবহার করে চীন ভারত মহাসাগরে পৌঁছে গেছে।

লন্ডনের দ্য ফরেন পলিসি সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী ব্রিটিশের পর ভারতীয় নেতারাও বালোচদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননি। ব্যাপারটা খুবই নৈরাশ্যজনক। বালোচদের স্বাধীন রাজা অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর অনুষ্ঠান শুনতে ভালোবাসতেন। ১৯৪৮ সালের ২৭ মার্চ অল ইন্ডিয়া রেডিয়োয় ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের সচিব ভিপি মেননের একটি বিবৃতি তাঁকে যারপরনাই হতাশ করেছিল। সেদিন ভিপি মেনন বলেছিলেন, 'কালাতের রাজা কালাতকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বারবার অনুরোধ করছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ভারত কিছুই করতে পারবে না।' পরের দিন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করেন। এমনকী নেহরুও ৩০ মার্চ ১৯৪৮-এ বিবৃতি দেন যে ভিপি মেনন যা বলেছেন তা ঠিক নয়। কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। বালুচিস্তান চলে গেছে পাকিস্তানের দখলে।

মানবাধিকার কর্মী ওয়াসিম আলতাফ হলেন, 'জিন্নার নির্দেশে ২৮ মার্চ ১৯৪৮ একরকম জোর করে বালুচিস্তানকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২৭ মার্চ ১৯৪৮, সপ্তম বালোচ রেজিমেন্টের কর্নেল গুলজার ও মেজর জেনারেল মহম্মদ আকবর কালাত রাজ্য আক্রমণ করেন। মহম্মদ আকবরের তত্ত্বাবধানে কালাতের শাসক আহমেদিয়ার খানকে করাচিতে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে পাকিস্তানে যোগদানের চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে কার্যত বাধ্য হন আহমেদিয়ার খান। ভারত যখন বালুচিস্তানকে নিয়ে কী করা যায় ভাবছিল তখনই পাকিস্তান মনস্থির করে ফেলেছিল। ২২ মার্চ ১৯৪৮ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান এই বিষয়ে স্থল, নৌ ও রায়ুসেনার প্রধানের সঙ্গে বৈঠক সেরে ফেলেছিলেন। এবং সেইমতো পাকিস্তানের নৌসেনার দুটি ডেস্ট্রয়ার পৌঁছে গিয়েছিল পাসনি ও জিওয়ানিতে।

নেহরু মনে করতেন পাকিস্তান শক্তিশালী হলে এই অঞ্চলে শান্তি বিরাজ করবে। এই ভাবনা নেহরুর সামরিক অদূরদর্শিতা নির্মমভাবে প্রমাণ করে। সেইসঙ্গে ভূরাজনৈতিক চেতনার অভাবও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। নেহরু বালুচিস্তানের সামরিক গুরুত্ব এবং ভারত মহাসাগরের সঙ্গে এর ভৌগোলিক নৈকট্য কোনওটাই ঠিক মতো অনুধাবন করতে পারেননি। এমনকী চীন ও পাকিস্তানের ভূরাজনৈতিক সমীকরণও তিনি আন্দাজ করতে পারেননি।

নেহরুর বিদেশনীতি নিয়ে ড. আম্বেদকর বলেছেন, 'এটা (নেহরুর বিদেশনীতি) আমার কাছে যে শুধু বিরক্তিকর তাই নয়, একইসঙ্গে যথেষ্ট উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তার কারণ।' আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা আর সবার কাছে ভালো হওয়ার বাসনা কতটা বিপজ্জনক হতে পারে তার থই পাওয়া দুঃসাধ্য।' নেহরু নিজেকে একজন কূটনীতিক বলে মনে করতেন। কিন্তু কূটনীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল বলে মনে হয় না। একজন কূটনৈতিক হবেন মৃদুভাষী কিন্তু সারা বিশ্বের ভূ-সামহিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তীক্ষ্ণ জ্ঞান থাকবে। কারণ কূটনীতির সর্বোচ্চ লক্ষ্য হলো দেশের জাতীয় ও সামরিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া। কিন্তু আদর্শবাদী (বা কল্পনাবিলাসী) নেহরুর কাছে কূটনীতির অর্থ হলো দেশের সামরিক স্বার্থ ও লাভ-ক্ষতিকে উপেক্ষা করা। নেহরু যে ভারতীয় উপমহাদেশে অবাধ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন, সে ব্যাপারে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু শান্তি মানে দুর্বলতা নয়। নেহরুর জন্যেই বালুচিস্তান দখল করেছিল পাকিস্তান। এবং এইভাবে উত্তর সীমান্তে তিনি পাকিস্তানকে শক্তিশালী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ নেহরু চীনকে ছেড়ে দিয়ে চীনকে এশিয়ার দৈত্য হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভারত চীনের ফ্যাকাসে ছায়ায় পরিণত হয়েছিল। ভাগ্য ভালো, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতকে চীনের সমকক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে অনেকাংশে সফল হয়েছেন।

১৯৬২ সালের যুদ্ধে নেহরুর দুর্বল নীতির জন্যেই চীন লাদাখের একটি বিশাল ভূখণ্ড দখল করতে পেরেছিল, যে ভূখণ্ড আজ আকসাই চীন নামে পরিচিত। নিজের ভুল সম্বন্ধে উদাসীন নেহরু সেদিন প্রবল উন্নাসিকতায় বলেছিলেন, 'কী হয়েছে চীন নিয়েছে তো! ওখানে তো একগাছি ঘাসও জন্মায় না।' কিন্তু নেহরু বুঝতে পারেননি ঘাস না জন্মালেও ওই চুরি করা ভূখণ্ড (আকসাই চীন) পাক অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট- বালটিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করার সুবিধা দেয় এবং পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত-বিরোধী ষড়যন্ত্রের জমিও প্রস্তুত হয়।

চীনের বিআরআই পরিকল্পনার অন্তর্গত চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডরের কথা সকলেই জানেন। এই করিডরের একটি প্রধান কেন্দ্র হলো বালুচিস্তানের গোয়াদর বন্দর। নামে বাণিজ্যিক হলেও এই করিডোরের মূল উদ্দেশ্য যে সামরিক এবং তা ভারতেরই বিরুদ্ধে সেটা আজ আর কারোর অজানা নয়। বস্তুত সিপিইসি দিয়েই ভারতকে ঘিরে ফেলতে চায় চীন ও পাকিস্তান। স্ট্রিং অব পার্লস নামে খ্যাত এই পরিকল্পনা। নেহরু জীবনে অনেক ভুল করেছেন। তবে সব থেকে বড়ো ভুল যে বালুচিস্তান নিয়ে করেছিলেন আজ আর সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। □

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন পশ্চিমবঙ্গের মহিলারাঃ রূপা গাঙ্গুলী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গুজরাটের কর্ণাবতীতে অনুষ্ঠিত 'সাবরমতী সংবাদ' সম্মেলনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ রূপা গাঙ্গুলী পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন। বাঙ্গলার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, অগ্নিগর্ভ বাঙ্গলায় মহিলারা আতঙ্কের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছেন। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছেন তারা। কিন্তু সাদা চোখে এসব ধরা পড়বে না। এখানে কোনও মা তাঁর বাচ্চাকে বাজারে কিছু কিনে আনতে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন না। একটু দেরি হলেই তাঁর মনে উলটো-পালটা চিন্তা আসতে থাকে, কারণ এখানে যে কাউকেই খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। মৃতদেহ চেনা যায় না কখনও কখনও। দিনের শেষে যাদের সন্তান বাড়ি ফিরে আসে সেই মায়েরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন।

রূপা গাঙ্গুলী বলেন, বাঙ্গলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত দুস্কৃতীদের জেল থেকে বের করে প্রশাসনের মাথায় বসিয়ে দিয়েছেন। তারাই

এখানে সন্ত্রাস তৈরি করে রেখেছে। তিনি প্রশ্ন করেন, মোমিনপুরে কেন হিন্দুদের মারা হলো? মুসলমানরা কেন হিন্দুদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিল? পুলিশ কেন হাত-পা গুটিয়ে বসেছিল? অথচ প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার না করে বেছে বেছে হিন্দু ছেলেদের জেলে ভরেছে পুলিশ। এমনকী মোমিনপুরের অকুস্থলে বিজেপি নেতাদের যেতে বাধা দিয়েছে পুলিশ।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরই বোঝা গিয়েছিল, যে বাঙ্গলায় কেউ তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া অন্য রাজনৈতিক দলকে ভোট দিলে বা যদি তাদের সমর্থন করে তাহলে তাদের বেঁচে থাকা খুব মুশকিল। এখানে প্রতিদিনই কোনও না কোনও মহিলার সঙ্গে নির্ভয়ার মতো ধর্ষনের ঘটনা ঘটে। এমনকী দিব্যাঙ্গ ও গর্ভবতী মহিলাদেরও ছাড়ে না দুস্কৃতীরা। বাঙ্গলার মিডিয়া এই ধরনের খবর ছাপে না। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেসব ঘটনায় শাসকদলের আশ্রিত গুন্ডারা জড়িত থাকে। বাংলাদেশে হিন্দু অত্যাচার প্রসঙ্গে রূপা বলেন, 'ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় রাতের অন্ধকারে আমাদের বাঙ্গলাদেশ থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। ওখানে থাকলে আমরা হয়তো সুরক্ষিত থাকতাম না। আজকের পশ্চিমবঙ্গেও একই পরিস্থিতি। কিছুদিন অন্তর এখানে দাঙ্গা বাঁধছে। শাসকদল ও প্রশাসন বিশেষ সম্প্রদায়কে আড়াল করে তাদের আরও প্রশ্রয় দিচ্ছে। আর নির্যাতিতদের জেলে পুরছে। এই অরাজকতা বন্ধ হওয়া দরকার।

কালী মূর্তির মুখ ভাঙচুরের ঘটনায় চাঞ্চল্য মালদায়

বিশেষ প্রতিনিধি ।। গত ২৭ অক্টোবর রাতে মালদা জেলার মানিকচক থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধরমপুর গ্রামের ১০০ বছরের প্রাচীন কালী মূর্তির মুখ ভাঙচুরের ঘটনায় জেলাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওইদিন রাতে গর্ভগৃহে কালী মূর্তির মুখ ভাঙা দেখে গ্রামবাসীরা স্থানীয় থানায় খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কারিগর ডেকে মূর্তি মেরামত করার প্রস্তাব দেয়। গ্রামবাসীরা সেই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় কালীমূর্তি বিসর্জন দেওয়ার কথা বলে পুলিশ। প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা পরের দিন কালো কাপড়ে কালীমূর্তি ঢেকে এলাকায় মৌন মিছিল করার কথা বললে পুলিশের সঙ্গে বচসা বাঁধে। আশপাশের এলাকায় পুরুষ-নারী নির্বিশেষে লাঠি চালায় পুলিশ। এবং জোর করে কোনও প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ছাড়াই পাশের পুকুরে সোনারূপোর গয়না সমেত কালী মূর্তি বিসর্জন করে দেওয়া হয়। রাতে গ্রামের কয়েকজনকে আটক করা হয় থানায়।

প্রসঙ্গত, ধরমপুর গ্রামের এই মন্দির নিয়ে বিবাদ চলে আসছে বহুদিন ধরেই। মনিরুল ইসলাম নামে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা দুবছর আগে মন্দিরের কিছু অংশ তাঁর বলে দাবি জানায়। পুলিশ অবশ্য সে দাবিতে আমল দেয়নি। এবারেও কালী পুজো বন্ধের হুমকি দেয় মনিরুল। পুলিশ গ্রামবাসীদের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে মনিরুলের অপরাধ আড়াল করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, মনিরুলের বিরুদ্ধে করা গ্রামবাসীদের অভিযোগপত্রটি তুলে নিতে বলা হয়।

ধরমপুর ও আশেপাশের এলাকায় জাগ্রত দেবী রূপে পূজিতা হন এই মা কালী। তাঁর মূর্তিতে ভাঙচুর কে বা কারা করল তার কোনও কুলকিনারা না করেই জোর করে বিসর্জন দিল পুলিশ। পুলিশি অত্যাচারের ভয়ে মুখ না খুললেও ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ। ইংলিশবাজারের বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র এলাকা পরিদর্শনে গেলে তাঁর কাছে দোষীর শাস্তির দাবি জানায় স্থানীয় মানুষজন।

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ১৯।।

সংস্কৃতে এম. এ. পাশ করে গবেষণা শুরু করার সময়ে মহেন্দ্রজীর নির্দেশে তিনি দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. পড়া শুরু করলেন। তিনি বুঝেছিলেন, পাশ্চাত্য দর্শনের জ্ঞান না থাকলে তাঁর কাজ সম্পূর্ণ হবে না। বৈরাগীর বেশেই তিনি সে বাধাও অনায়াসে পেরিয়ে গেলেন। দু'বছর পর পরীক্ষা দিয়ে খুব ভালো ফল করলেন।

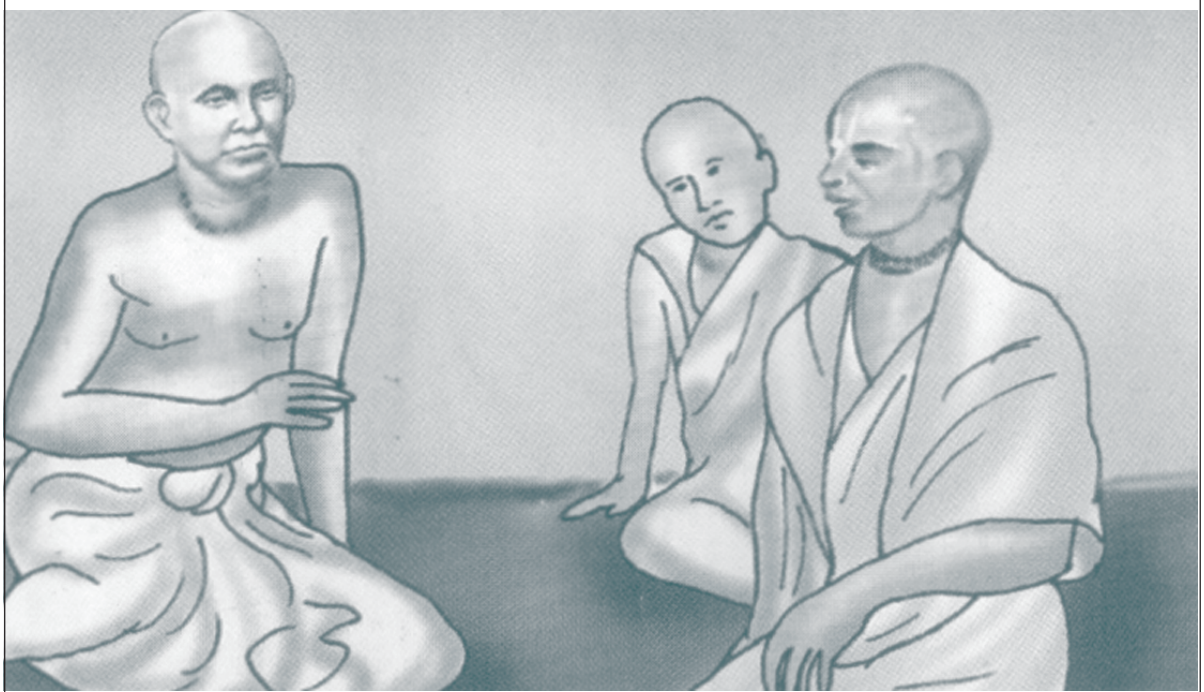

ফল জানার আগেই ফরিদপুরে শ্রীঅঙ্গনে মহেন্দ্রজী ডেকে পাঠালেন তাঁকে। জানালেন, আমেরিকা থেকে বিশ্বধর্ম সম্মেলনের আমন্ত্রণ এসেছে। সেখানে গিয়ে জগদ্বন্ধুসুন্দরের নব বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে হবে। এ কাজ করতে হবে মহানামব্রতকেই।

(ক্রমশ)